মেয়েদের নিজস্ব পত্রিকা

সুকন্যা

১৬ – ৩০ জুন ১৯৮৫



জাতীয় কংগ্রেসের শতবর্ষ ঃ নারীর ভূমিকা

বম্বে ফিল্মি জগৎ এখন তরুণীদের দখলে

খাদ্য ও ক্যালরি

সন্ধ্যা রায়ের সুখ-দুঃখ



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ নিলয় হাজরা

স্ক্যান ঃ দেব কুমার দেব

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com


খাটা খাটনি তো সবার লেগেই আছে! আমার স্বামীর অফিস, ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজ, আর আমার হাট-বাজার করা। তাই আমরা নিয়ম করে অন্তত হরলিক্স টুকু রোজ সবাই খাই।
হরলিক্স আমাদের পরিবারের সকলেরই সাথী।
হরলিক্স ঘন দুধ, মল্টেড বার্লি আর সোনালী গমের দানার পুষ্টিগুণে ভরা একটি সুস্বাদু পানীয়।
১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে, পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি পরিবারে পুষ্টি যুগিয়ে আসছে।
Horlicks
The Great Nourisher
নতুন যুগের নতুন রূপে
piccadily Restaurant
KAMAL READYMADE
পুষ্টি যোগাতে অদ্বিতীয়
HTD-HMM-8072BEN

সুকন্যা

বর্ষ ২ সংখ্যা ১/১৬ – ৩০ জুন ১৯৮৫/১ – ১৫ আষাঢ় ১৩৯২

সম্পাদকীয়

পাক্ষিক 'সুকন্যা' প্রকাশের দ্বিতীয় বর্ষের সূচনা হল এই সংখ্যা থেকে। গত এক বছরে 'সুকন্যা' প্রকাশ করতে গিয়ে বলাই বাহুল্য, আমরা নানা দিক থেকেই কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, এর মধ্যে সব চাইতে সুখকর অভিজ্ঞতা এই যে, আমাদের পরিকল্পনা ও উদ্যোগে 'সুকন্যা' প্রথম প্রকাশিত হলেও, এখন আমাদের ভাবনা-চিন্তার অংশীদার আপনারাও – যাঁরা এই পত্রিকায় লেখেন, যাঁরা এই পত্রিকা বিক্রি করেন এবং যাঁরা এই পত্রিকা পড়েন ও অপরকে পড়ান। আপনারা সকলে আমাদের শুভানুধ্যায়ীই নন শুধু, এগিয়ে যাবার নির্ভরযোগ্য সংগী। 'সুকন্যা'র এক বছর পূর্তি উপলক্ষে আপনাদের সকলকে জানাই আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন, এই এক বছরের মধ্যেই 'সুকন্যা' তার বিভিন্ন বিভাগে শুধু পরিবর্তনই আনেনি, পরিণতও হয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তন ও পরিণতি, আমাদের স্বীকার করতে দ্বিধা নেই; আপনাদের মনস্ক পরামর্শ, প্রশংসা ও সমালোচনারই ফল।

আমরা এর আগেও একবার বলেছি, এই সুযোগে আবার উল্লেখ করছি, 'সুকন্যা' যাঁরা পড়ছেন তাঁদের কাছে কোনোরকম চমক সৃষ্টি করার ইচ্ছা আমাদের পরিকল্পনায় আগে যেমন ছিল না, এখনো তেমনি নেই। তাঁদের কাছে পত্রিকাটিকে আরো বেশি প্রয়োজনীয় করে তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য। তাঁদের চাহিদা ও ইচ্ছা পূরণই আমাদের লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, আমাদের সম্পাদকীয় বিভাগের উদাম, তৎপরতা এবং আপনাদের আন্তরিক ও সক্রিয় সহযোগিতার সহবস্থানেই এই লক্ষ্য সার্থক হয়ে উঠতে পারে। আমরা চাই, 'সুকন্যা'র প্রতিটি সংখ্যার যা কিছু ভালো তার প্রশংসা করে এবং যা কিছু অপছন্দের তার সমালোচনা করে আপনারা ইতঃপূর্বে যেমন করেছেন আগামী দিনেও তেমনি এর সম্পাদকীয় বিভাগকে একই সংগে উৎসাহিত ও সতর্ক করুন।

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ পরিচিতি : ডলি রায় ॥ ফটো : গৌতম রায় সন্ধ্যা রায় ॥ ফটো : অর্ধেন্দু রায়

সম্পাদিকা : গীতা চৌধুরী

শিল্প-উপদেষ্টা : নিতাই ঘোষ

প্রতি সংখ্যা তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা
বিমান মাশুল পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা, ভারতের অন্যান্য স্থানে ৪০ পয়সা

সম্পাদকীয় দপ্তর ও রেজিঃ অফিস : ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড
৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২
চিফ এগজিকিউটিভ, বিপণন, বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ : সি এইচ বসু

দিল্লি অফিস : জোনাল ম্যানেজার, নর্দার্ন জোন : ওয়াই এ শেঠি
জনসংযোগ : শ্রীমতী গায়ত্রী রায়, সূর্যকিরণ বিল্ডিংস, ফ্ল্যাট ১২১২,
১৯ কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নতুন দিল্লি ১১০ ০০১, ফোন : ৩৩১-৭০২৪

বোম্বাই প্রতিনিধি : ভি সত্যমূর্তি, ফ্ল্যাট নং ১, বিল্ডিং নং ৪, টুইংকল স্টার কো অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি, ঘাটলা, চেম্বুর, বোম্বাই ৪০০০৭১
ফোন : ৫৫১-৬২৬২, ৫৫১-০৫৯২

মতামত

পোশাক ও সাজসজ্জা সংখ্যা

'সুকন্যা' পত্রিকার ৯ মে সংখ্যাটি পরিকল্পনায় অভিনব। মেয়েদের পোশাক ও সাজসজ্জা নিয়ে ছবি ও রচনায় এরকম অভিনব প্রচেষ্টার তুলনা নেই। কিন্তু মেয়েদের সাজপোশাক নিয়ে প্রায় দু ডজনের মত লেখার মধ্যেও দুটি বিষয়ের ওপর লেখার অভাব বোধ করেছি। এক, শাড়ি মেয়েদের চিরন্তন, শাশ্বত ও শ্রেষ্ঠ সজ্জা হলেও কেন বহু মেয়েই ম্যাক্সি-মিডি এবং সর্বোপরি শার্ট-প্যান্টের দিকে ঝুঁকেছেন? দুই, মেয়েদের অনেকদিন ধরে একটা প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে – সবকিছু ম্যাচিং। মাথার টিপ থেকে হাতের ভ্যানিটি ব্যাগ, এমনকি জুতোর রঙও ম্যাচিং হওয়া চাই শাড়ি-ব্লাউজের সঙ্গে। কেন?

যাইহোক সংখ্যাটি বিশেষ করে মেয়েদের সংগ্রহে রাখার মত।

ওই সংখ্যায় মতামত বিভাগে 'বাংলা ভাষায় শিক্ষকতা' বিষয়ে সাগরিকা সরকার তাঁর চিঠিতে অনেক কথা লিখেছেন, তবুও তা অনেকাংশে সঠিক নয়। যেমন – সব স্কুলেই বাংলা ও ইংরেজী ভাষা পড়ানোর জন্য শিক্ষক দরকার। অধিকাংশ স্কুলে এই একটি বিষয় পড়ানোর জন্য অন্ততপক্ষে তিন বা চারজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা থাকেন। প্রায়ই দেখি বহু স্কুলই বাংলায় শিক্ষক নেন। তবুও কেন অধিকাংশ বাংলা পাশ-করা ছাত্রছাত্রীরা চান্স পান না? এর আসল কারণ তাহলে সবিনয়ে জানাই।

'বাংলা'য় প্রতি বছর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-পরিমাণে ছাত্রছাত্রীরা পাশ করে থাকেন, স্কুলে সে-পরিমাণে পদ শূন্য হয় না। শুধু তাই নয়, বাংলায় পাশ করে আমাদের একটা ধারণা থাকে (আমিও এই ধারণার বাইরে নই) আমরা স্কুলে ছাড়া চাকরি করব না বা পাব না। কিন্তু আমরা কজন বাংলায় পাশ করে প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষায় বসে অন্য পেশা নিতে রাজি হই? এ কথাগুলো অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ আমি নিজে একজন ভুক্তভোগী। তাছাড়া স্কুল ইচ্ছে করলেই একাধিক বাংলার শিক্ষক নিতে পারেন না; শিক্ষক নেওয়ারও নিয়মকানুন আছে। আর নবম শ্রেণীর আগে পর্যন্ত বাংলা পড়ান অ-বাংলার শিক্ষকরা। এরকম ধারণা সাগরিকা দেবীর হল কেন জানি না। কিছু স্কুলে হতে পারে। কিন্তু আমি আমার আশেপাশের ১০/১২টি স্কুলের কথা জানি যাঁরা অন্ততপক্ষে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকেই ক্লাসে বাংলা পড়াবার ব্যবস্থা করেন বাংলার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দিয়ে। তাই বাংলায় শিক্ষকতার সুযোগ সীমাবদ্ধ-এ জন্যে স্কুলকে সম্পূর্ণরূপে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

সুকুমার রায়
বাবুয়া, কোলাঘাট
মেদিনীপুর

১৬ মে সংখ্যা প্রসঙ্গে

'সুকন্যা'র ১৬ মে সংখ্যায় 'উচ্চশিক্ষায় প্রথম লোধা নারী: চুনী কোটাল' ও 'প্রথম মহিলা ট্রাক ড্রাইভার পার্বতী দেবী' প্রসঙ্গে লিখিত প্রতিবেদন দুটি খুবই সময়োচিত। এই দুই নারীর প্রচেষ্টা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাব ও কর্তব্যবোধ সত্যিই কৃতিত্বের দাবি রাখে। এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, ভারতবর্ষে নারীজাতি এখনও অবহেলিত। প্রতি পদে পদে নারীর অগ্রগতি নানান বাধার সম্মুখীন হয়। তবুও এইসব বাধা অতিক্রম করে চুনী কোটাল ও পার্বতী দেবী যে সাহস ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা নারীজাতির প্রত্যেকের কাছে গৌরবের বিষয়। এই দুই নারীর জীবনী প্রকাশিত করে সুকন্যা সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। আমরা আশা করব আগামী কোনো সংখ্যায় ভারতের ও এশিয়ার প্রথম মহিলা ইংলিশ চ্যানেল সাঁতারু আরতি সাহা এবং ভারতের প্রথম নারী প্যারাসুট জাম্পার ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট গীতা চন্দের জীবনী যেন প্রকাশ করা হয়। এইসব কৃতিত্বসম্পন্ন নারীর জীবনী পড়ে আমাদের যুবতী নারীরা উৎসাহ বোধ করবেন এমন আশা করা যায়।

এছাড়া 'আমেরিকায় সংসার দেখার দায়িত্ব কি শুধু মহিলাদের?' প্রতিবেদনটিও মনোযোগ সহকারে পড়লাম। হিটলার একবার বলেছিলেন, সংসার বা গৃহস্থালির যাবতীয় কাজই হল মহিলাদের দায়িত্ব, তবে বিশেষ প্রয়োজনে তাঁরা নার্সের বা লেডী ডাক্তারের কাজ করতে পারেন। ভারতবর্ষে আবহমানকাল থেকে মহিলারাই সংসার দেখার যাবতীয় দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন এবং এর কোনো প্রতিকার হওয়া এখন সম্ভব নয়। শ্রীমতী আলোলিকা মুখোপাধ্যায় এখানে লিখেছেন আমেরিকা ও কানাডায় নানানরকম সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ওখানকার নারীরা এখন সংসার দেখার দায়িত্ব নিতে চান না। কেননা ওখানকার নারীরা খুবই স্বাধীনচেতা।

আমাদের মা ও ঠাকুরমাকে দেখেছি, সংসারের যাবতীয় কাজ নির্দ্বিধায় করে যেতেন। তখনকার দিনে কেউ গ্যাসে রান্না করত না, তবুও তাঁরা রান্নায় একটা আনন্দ পেতেন এবং লোকেদের খাওয়াতেও সুখ পেতেন। সবচেয়ে যা উল্লেখযোগ্য ছিল সেটা হল, তখন লোকেদের এত বেশি চাহিদা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একবার এক কৃষক বলেছিলেন, আগে গ্রামের বাড়িতে কেউ এলে চিড়ে-গুড়েই সন্তুষ্ট হত, কিন্তু এখন আর হয় না। মহিলারা যদি সংসারের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন, তাতেই স্বামী ও সন্তানদের উন্নতি ও সংসারে শান্তি আসে।

ভূপেন বসু ও কল্যাণী বসু
টেলকো কলোনি
জামশেদপুর – ৪

পুরানো সে দিনের কথা



কনকলতা পালিত

সম্প্রতি এক দুপুরে তিনি এসেছিলেন। আমাদের সমস্ত দপ্তর তখন ছিল কর্মব্যস্ত। শ্রীরামপুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের একদা বালিকাবধূ আজ বৃদ্ধ পিতামহী কনকলতা পালিত, সঙ্গে তরুণী নাতনী ইংরাজি সাহিত্যের ছাত্রী। পথঘাটের জ্যামজট পেরিয়ে পিতামহী ও নাতনী এসেছিলেন প্রতিবাদ জানাতে 'সুকন্যা'র দপ্তরে।

কিন্তু বেনিয়াপাড়া লেন, শ্রীরামপুর নিবাসিনী কনকলতা দেবীর প্রতিবাদের পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ব্যক্তিগত কোনো সম্মানহানির প্রতিবাদ নয়, এ প্রতিবাদ সেই সময়ের বাজার দর সংক্রান্ত একটি রচনার বিরুদ্ধে (সংসারের ব্যয়: পঞ্চাশ বছর আগে ও পরে, ১৬-সেপ্টেম্বর '৮৪, সুকন্যা)। পদ্যাকারে প্রতিবাদপত্র নিয়ে হাজির হয়েছিলেন দপ্তরে কনকলতা দেবী। পদ্যে লেখা প্রতিবাদপত্রটি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি, 'গঙ্গার ইলিশ তখন সের দরে নয়/একটাকায় চারটে ইলিশ মাছ হয়।/জ্যান্ত বড় কাটা পোনা পাঁচ আনা করে –/চিংড়ি গঙ্গার খয়রা এক আনা সের।/মৌরলা মাছের সের ছ পয়সা নেয়/চার আনা সেরে বড় শোলমাছ দেয়/মোটা বড়সিঙি মাছ চার আনায় দিত/ন পয়সায় ছটা ডিম এসে দিয়ে যেত' – এইভাবে কনকলতা দেবী সেকালের বাজার-দরের এক ফিরিস্তি দিয়েছেন। তাঁর মতে 'সুকন্যা'য় প্রকাশিত রচনায় তখনকার বাজারের যে মূল্যমান দেওয়া হয়েছে তা সর্বাংশে ঠিক নয়।

সুখের দিন, শখের দিন ছিল কি সেইসব হারানো দিনগুলো? অতীত সব সময় স্মৃতিমেদুরতায় মোহবিস্তার করে। মানুষকে বড় দুর্বল করে। তিরাশি বছর বয়সেও এক ঋজু আত্মবিশ্বাস ও সততা নিয়ে কনকলতা দেবী দিনযাপন করছেন মূল্যবোধ হারানো এই সমাজে।

এক রক্ষণশীল পরিবারে বালিকাবধূ হয়ে এসে নিজের চেষ্টায় সাক্ষরতা লাভ করেছিলেন কনকলতা দেবী। পয়ার ছন্দে পদ্য লিখেছেন অসংখ্য। নিজের বিদ্যা সম্পর্কে কোনো মিথ্যা অভিমান নেই, তাই তিনি লিখেছেন, – 'প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষা আর বোধোদয়/এই তিন বই পড়ি বিদ্যা আমার হয়/বিদ্যাসাগর মশায়ের বই তিনখান৷ পড়েছি তাই বিদ্যা এত করেছেন দান।' – কনকলতা পদ্যচর্চায় আধুনিক নন। কিন্তু একটা বিশেষ সময়ের মানুষ, একান্নবর্তী পরিবার, বাজার দর, টাকায় চারটে ইলিশ, জিলিপি, কচুরি, অমৃতির দাম এবং ঈশ্বরভক্তি, পতিভক্তি, সন্তান বাৎসল্য সব কিছুর এক বিচিত্র রসায়নে তৈরি হয়েছে হারানো দিনের বাতাবরণ।

প্রতিদিন তিনটি সংবাদপত্র ও বেশ কয়েকটি সাময়িক পত্রিকা পালিত বাড়ির বৃদ্ধা পিতামহী আজও পড়েন। পুত্র ও পুত্রবধূরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত। জীবনে অনেক শোক দুঃখ তাঁকে দগ্ধ করলেও তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। আজও কনকলতার জীবনে লেখাপড়া শুধুমাত্র অবসর বিনোদন নয়। জীবনের অচরিতার্থ বাসনার এক ধরনের আত্ম সম্মোহন। স্কুল, কলেজের দরজা না পেরিয়েও ঘর সংসারের কাজকর্মের ফাঁক ফোকরে তিনি লিখেছেন, 'দুর্গা', 'মাইকেল মধুসূদন', 'রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ' এবং 'রামকৃষ্ণ', 'বিবেকানন্দ' প্রমুখ মহাপুরুষের জীবনকথা পয়ার ছন্দে। তাঁর জীবন ছন্দে আছে নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার যতিচিহ্ন।

পুরানো সে দিনের কথা যিনি আজও ভুলতে পারেননি, কিন্তু নতুনের প্রতিও আছে সমান আগ্রহ, যে-কোনো পত্রিকার পক্ষে এমন এক প্রবীণা পাঠিকা পাওয়া নিঃসন্দেহে গৌরবের।

প্রতিবেদন: 'সুকন্যা' সম্পাদকীয় দপ্তরের পক্ষে

ফটো : অজিত সাহা

সুকন্যা

১ জুলাই ১৯৮৫ সংখ্যা

ইতিহাসের পর্দায় নারী

কোনো এক সময়ে মানব সভ্যতা মাতৃতান্ত্রিক ছিল বলে সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন। যদিও তার দৃষ্টিগ্রাহ্য ইতিহাস নেই। তবে লিখিত ইতিহাসের প্রথম দিকে মেয়েরা অনেক কিছু অধিকার ভোগ করতেন। মধ্যযুগে যার প্রায় বিলুপ্তি ঘটে। রোমান, গ্রীসিয়ান, মিশরীয়, ইহুদি ও ভারতীয় সভ্যতায় লিখিত ইতিহাসের সময় থেকে মেয়েরা কোথায় কতটুকু মর্যাদা ও অধিকার পেত তারই ধারাবাহিক আলোচনা এই প্রবন্ধে করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সেকালের সমাজ কাঠামো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মেয়েদের বিচরণকেও তুলে ধরা হয়েছে।

শিল্পীর চোখে নারী ঃ মহাশ্বেতা দেবী

মহাশ্বেতা দেবীর সংস্কৃতি চেতনা গড়ে উঠেছে পৈতৃক উত্তরাধিকার সূত্রে। ছোট থেকেই ব্যক্তিত্বশালিনী ঠাকুমার প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল। দিদিমা ছিলেন শিক্ষিতা স্বদেশচেতনা সম্পন্না মহিলা। এ ছাড়া পরিবারের ও অন্যান্য আত্মীয় মহিলাদের সকলেই তাঁকে শৈশব থেকে চরিত্র গঠনে সাহায্য করেন। তিনি বলেছেন ঃ 'পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েদের যথেষ্ট সচেতন হতে হয়। শিক্ষিতা চাকরিজীবী নারীরা পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় অথচ তার প্রতিবাদ করে না – এটা অত্যন্ত দুঃখের। …… কিন্তু মেয়েদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা হারাইনি ……।'

প্রথম মেয়ে চৌকিদার দ্রবময়ী দাসী

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন পুলিশে মেয়েদের কোনো স্থান ছিল না, তখন দ্রবময়ী দাসী নামে এক বিধবা মহিলা প্রকাশ্য দিবালোকে পুরুষের সঙ্গে লাঠি ঘুরিয়ে ঊর্ধ্বতন সাহেবকে মুগ্ধ করে মৃত স্বামীর চৌকিদারি-র কাজে বহাল হয়েছিল। গল্পের চেয়েও উত্তেজনাময় ঘটনাটি লিপিবদ্ধ হয়েছে এই প্রতিবেদনে।

ঘরের মধ্যে ঘরছাড়া

ঘরের কাজের লোক আজ বাঙালির জীবনে প্রায় অপরিহার্য। অথচ দিন বদলাচ্ছে। সেইভাবে ঘরের কাজ করার লোক পাওয়া যায় না। অশিক্ষিত দরিদ্র সম্প্রদায়ের মানুষও আর স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে দুবেলা খেতে রাজি নয়। এখনকার গৃহিণীদের অসহায় অবস্থা, কাজের লোকের অভাবের কারণ এই সব নিয়ে একটি বাস্তব প্রতিবেদন এই রচনাটি।

আপনার সন্তান

ধারাবাহিক এই রচনাটিতে এবার থাকছে জীবনে অপরিহার্য দুটি জিনিস। এক, ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা সাধন ও দুই, মাতৃভাষায় যথার্থ শিক্ষা। প্রকৃত মানুষ হয়ে দাঁড়াতে গেলে শিশু বয়স থেকেই এই দুটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হতে হবে।

অগ্রহায়ণের কৃষ্ণচূড়া ঃ অখিলবন্ধু ঘোষ

তিন দশক আগের সঙ্গে আজকের গানের তফাত অনেক। তাই আজ অখিলবন্ধু ঘোষকে পঞ্চাশের নিচের বয়েসের মানুষরা কজনই বা চেনেন! অথচ অখিলবন্ধু ঘোষ আজো তেমনি আছেন – সেই একই গায়কী, নিয়ে। অনুপম ঘটকের সুরে গানের রেকর্ড করেছেন কিন্তু ইদানীং কোনো রেকর্ড নেই। ভাবতে অবাক লাগে বিস্মরণ-প্রিয় বাঙালি এই শিল্পীকে ভুলতে বসেছে। অখিলবন্ধু ঘোষ গানের তালিম নিয়েছেন তারাপদ চক্রবর্তী, চিন্ময় লাহিড়ীর কাছে – গেয়েছেন বিখ্যাত শচীনদেবের মনমাতানো গান। তাঁরই ইদানীংকার জীবন, ভাবনা, ধ্যানধারণাকে লেখক স্নিগ্ধ সুরের আরতিতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

এ ছাড়া অন্যান্য আকর্ষণীয় রচন ও সকল নিয়মিত বিভাগ।

মতামত

লাইব্রেরিয়ান ঃ তথ্য সংশোধন

অসিতকুমার চৌধুরী লিখিত 'লাইব্রেরিয়ান' লেখাটির (১৬ এপ্রিল) কিছু তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি লিখেছেন, 'ভারতের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েই লাইব্রেরি সায়েন্সে ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমা পড়ানো হয়।' সেই সঙ্গে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কত বছরের ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা কোর্স – তারও উল্লেখ করেছেন। তিনি যে তথ্য দিয়েছেন তার অধিকাংশই সঠিক নয়। যেমন – (১) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ বছরের ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হয়, ডিপ্লোমা নয়। (২) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ বছরের ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হয়, ২ বছরের নয়। (৩) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ বছরের ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হয়, ২ বছরের নয় ইত্যাদি। তিনি আরও লিখেছেন – 'নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানেও লাইব্রেরি সায়েন্স ও এ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।' যেমন (১) ন্যাশনাল লাইব্রেরি, বেলভেডিয়ার, আলিপুর। – ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না। (২) পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন। – এই নামে কোনো প্রতিষ্ঠান নেই, যদিও ঠিকানা ঠিক লিখেছেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের নাম বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন। (৩) ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স ডকুমেন্টেশন সেন্টার, কলকাতা। – এখানে কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না। ওই অফিসের দিল্লির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিশেষ শিক্ষণ ব্যবস্থা আছে। (৪) ডকুমেন্টেশন রিসার্চ ট্রেনিং সেন্টার, বোম্বে। এটা বাঙগালোরে অবস্থিত। যে অর্থে প্রথম দুটি নাম উল্লেখ করেছেন সেই অর্থে ডকুমেন্টেশন রিসার্চ ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না। এখানে লাইব্রেরি সায়েন্সে উচ্চতর শিক্ষা দেওয়া হয় এবং এই পাঠক্রম 'মাস্টার অব লাইব্রেরি সায়েন্স' (M.Lib.Sc.)-এর সমতুল্য ধরা হয়। এরপর তিনি বেতনক্রম সম্বন্ধে যা লিখেছেন সে-সকল তথ্যও সঠিক নয়। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সরকারি দপ্তরে লাইব্রেরিয়ানের বেতনক্রম ৭০০–১২৫০ টাকা + ভাতা এবং সহকারী লাইব্রেরিয়ানের ৩৫০–৬০০ টাকা + ভাতা – অন্তত পশ্চিমবঙ্গের কোনো গ্রন্থাগারে এই ধরনের বেতনক্রম নেই।

এই ধরনের তথ্য আপনাদের বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশিত হলে পাঠক-পাঠিকারা বিভ্রান্ত হবেন এবং তাঁদের মনে সংশয় দেখা দেবে। সুতরাং অনুরোধ এই ধরনের তথ্য প্রকাশ করার আগে লেখক যেন তথ্যের সত্যতা বিচার করেন।

গৌতম গোস্বামী
কলকাতা

এয়ার হোস্টেস ঃ কর্মখালির বিজ্ঞপ্তি

'সুকন্যা'কে ভাল লাগার একটি বিশেষ কারণ আছে। তা হল, 'মেয়েদের কর্মসংস্থান' নামে আপনারা মেয়েদের জন্য যে বিভাগটি প্রকাশ করেছেন, তাতে আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারের বহু মেয়ের কর্মসংস্থান হয়ে যেতেও পারে; যা আজকালকার দিনে অপরিহার্য।

আপনারা ১ এপ্রিল সংখ্যায় এই বিভাগে এয়ার হোস্টেসের একটি বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। পড়ে খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু এই পদের জন্য কর্মখালির বিবরণ দেননি, যা পরবর্তী সংখ্যায় অন্য পদের জন্য দিয়েছেন। আপনারা এর জন্য কলকাতা, দিল্লি ও বম্বের অন্যান্য বড় বড় পত্রিকায় খোঁজ নিতে বলেছেন। যতদূর সম্ভব আমরা এ বিষয়ে খোঁজ রাখব, কিন্তু আমাদের এই ছোট্ট শহরে থেকে এ সম্বন্ধে খোঁজ রাখা সত্যিই অসুবিধাজনক। যদিও এমন পদে কাজ করার সবরকম যোগ্যতা হয়তো আমাদের আছে এবং এতে কাজ করার জন্য আমরা খুবই আগ্রহী।

অতএব, আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল, পরবর্তী কোনো সংখ্যায় এই পদের জন্য 'কর্মখালির বিজ্ঞপ্তি' প্রকাশ করবেন। তাহলে খুবই উপকৃত হব এবং উপকৃত হবে আমাদের মতো বহু পরিবারের মেয়ে, যারা খুব আগ্রহ সহকারে এই পদে কাজের জন্য এগিয়ে আসতে চায়।

রোখশানা প্রধান
হলদিবাড়ি
কোচবিহার

নৃত্যশিক্ষার্থীদের জন্য লেখা

'সুকন্যা'র গত বিনোদন সংখ্যায় কত্থক নৃত্যশিল্পী অমিতা দত্তর লেখাটি পড়ে খুব ভাল লেগেছিল। আমি একজন নৃত্যশিক্ষার্থী। সুতরাং আমি চাই মাঝে মধ্যেই যেন নৃত্য সম্বন্ধে ভাল ভাল সচিত্র লেখা 'সুকন্যা'য় বের হয়। আমার মনে হয় এইরকম লেখা বের হলে নৃত্যশিক্ষার্থীদের তো বটেই, অন্যান্যদেরও ভাল লাগবে।

সুচিত্রিতা চ্যাটার্জি
বিনয় সরকার রোড
মালদহ

'প্রেমিকারূপের সঙ্গে মাতৃরূপের সার্থক মিশ্রণের মধ্যেই আমার কাছে নারীর শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধ হয়েছে'

– আশুতোষ মুখোপাধ্যায়



আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

অনেকেই উপন্যাস লেখেন, কিন্তু কেউ কেউ জনপ্রিয়। আবার জনপ্রিয় উপন্যাসিকদের মধ্যে বিরলতর তাঁরাই যাঁরা কয়েক দশক ধরে নিজের জনপ্রিয়তাকে ধরে রাখতে পারেন। আজ চার দশক ধরে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সেই অবিমিশ্র জন-সমাদৃতির চূড়ায়। পঞ্চতপা, চলাচল, কাল তুমি আলেয়া, সাত পাকে বাঁধা, দীপ জ্বেলে যাই, নবরাগ, আমি সে ও সখা ইত্যাদি সহ বাংলা ছায়াছবির সাফল্যের স্বর্ণযুগের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়েছে তাঁর কাহিনীর স্তম্ভশীর্ষেই। একশটির মত উপন্যাস এবং পঁচিশটি গল্পগ্রন্থের রচয়িতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের লেখায় মহত্ত্বের ভান থাকে না বলেই বোধহয় তিনি পাঠক-পাঠিকার এত আপন। সম্প্রতি মেঘালয়ের এক অধ্যাপিকা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নারীচরিত্রের ওপর গবেষণা শুরু করেছেন। বর্তমান লেখাটির মধ্যে থেকে সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর হাতের সেই সোনার কাঠির –যার স্পর্শে তাঁর নারীচরিত্রেরা জেগে ওঠে।

'আমার তখন সাত আট বছর বয়স। পড়ি ঢাকার নবকুমার স্কুলে। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। আচমকা সাইকেল চাপা পড়ে গেলাম। রাস্তার পাশেই এক বাড়ি থেকে একটি উনিশ কুড়ি বছরের তরুণী আমায় চাপা পড়তে দেখে ছুটে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাড়াতাড়ি আমায় তুলে নিয়ে গিয়ে সেবা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। আমার সেই বালক বয়সের, সেই খুব ভয়-পেয়ে-যাওয়া, একান্ত অসহায় অবস্থার মধ্যে, সেই তরুণীর সেবার আন্তরিকতা, তার স্নেহ ও করুণায় ভরা মুখখানি আমার মনের মধ্যে একটি স্থায়ী সম্পদ, আমার স্মৃতির চিরকালের ঐশ্বর্য হয়ে রইল। তিনি বারবার ঘুরে আসেন আমার লেখার মধ্যে।'

কথায় কথায়, বেশ অল্পবয়সের জীবনে নারীর স্নেহ সান্নিধ্যের কথা বলতে বলতে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই স্মৃতিচিত্রটির উল্লেখ করলেন। প্রথম তারুণ্যের মধ্যে, জীবনের চারপাশকে মানুষ তখন যেভাবে গ্রহণ করতে পারে, সেই দেখাশোনা, সেই ভাললাগা মন্দলাগার ছাপটাই তার পরের জীবনের ওপর কাজ করে সবচেয়ে বেশি। গোড়ার জীবনের দেখাটাই পরের জীবনের দেখার চোখটা তৈরি করে দেয় অনেকখানি।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবনের শুরুতেও তাঁর মায়ের প্রশ্রয় ও সমর্থনই সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিল। ১৯২০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ওঁর জন্ম। ন' বছরে পড়ার আগেই চলে এসেছেন এপারে। তারপর পড়াশোনা শেষ করে চাকরি জীবনের প্রবেশপথে ওঁকে ক্রমাগত ব্যর্থতার আঘাত সইতে হয়েছে। কোনো চাকরিই ভাল লাগত না। মন দিয়ে কাজ করতে পারতেন না। একটা একটা করে দশটা চাকরি ছেড়েছেন। কর্মক্ষেত্রের এই ব্যর্থতা তাঁকে কেমন একটা নিরাশার গহ্বরে টেনে নিচ্ছিল। বছর কুড়ি বয়স তখন। ভেতরকার এই বিষাদটাকে উনি টেনে আনতে চাইতেন ওঁর কলমে। বাড়ির অনেকেই হাসাহাসি করতেন তাঁর লেখক হওয়ার চেষ্টা দেখে। তখন ওঁর মার ভূমিকাটা ছিল একেবারে আলাদা। মা কোনদিন হতাশ করেননি ওঁকে। মা কখনো অর্থকরী প্রত্যাশাকে বড় করে দেখেননি। পরবর্তীকালেও উনি লক্ষ্য করেছেন ওঁর লেখালিখির ব্যাপারে আত্মীয়াদের প্রেরণা আত্মীয়দের তুলনায় বেশি।

'জীবনে মানুষ তো কম দেখিনি। যখন দেখেছি চেষ্টা করেছি তার ভেতরটা দেখতে। বাইরের মানুষটার তুলনায় ভেতরকার মানুষটাই আমায় সবসময় বেশি টানে। হৃদয়ের সেই দরজা খোলা – সেখানকার উঁকিঝুঁকিতেই আমার আগ্রহ। এই দেখার মধ্যে আমার সবসময়েই মনে হয়েছে, হৃদয়ের জাগরণে মেয়েরা সাড়া দেয় বেশি, ফুলের মতো সেখানে ফুটে ওঠার সৌন্দর্য – অনেক বেশি আবেদন আনে আমার চোখে।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় পরিকল্পনা করেছিলেন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নারীচরিত্র নিয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করার। ডক্টর রায়ের অকস্মাৎ লোকান্তরের ফলে সে পরিকল্পনা অপূর্ণ থেকে গেছে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্বাস করেন, 'নারীচরিত্র ঠিক আঁকতে পারলে পুরুষচরিত্র তার পাশাপাশি আপনা থেকেই বড় হয়ে উঠবে।'

'আমার বেশিরভাগ লেখাতেই নায়িকা কিংবা অন্যান্য নারীচরিত্রের এজুকেশন ব্রিলিয়েন্স খুব একটা নেই। খুব অভিজাত ঘরের মেয়েদের নিয়েও বেশি লিখিনি। কিন্তু আমার মনে হয়, বহু শিক্ষিতা মহিলা এদের কাছ থেকে জীবনের পাঠ গ্রহণ করতে পারবেন। প্রেমিকারূপের সঙ্গে মাতৃরূপের সার্থক মিশ্রণের মধ্যেই আমার কাছে নারীর শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধ হয়েছে।

নারী প্রগতির পথে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটু আধটু বিভ্রান্তি দেখা যায়, ঠুনকো চাল হয়তো বা সেখানে নারীর শাশ্বত মহিমাকে আড়াল করতে চায়, সেটা কখনোই বড় হয়ে উঠতে পারে বলে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মনে করেন না। শিক্ষাবুদ্ধি দিয়ে তার ব্যক্তিত্বের জাগরণই তার লক্ষ্য হবে। জটিল যুগের হাজারো জটিলতার মধ্যেও কোনো প্রগতিশীলার পক্ষেই ওই শাশ্বত মহিমা হারাবার নয়। লেখক বিশ্বাস করেন, ব্যক্তিগত, পরিবারগত কিংবা সমাজগত যেকোনো বড় কাজের মধ্যে নারীর সাবলীল ব্যক্তিত্ব যখন হাল ধরে, তখনই সে কাজে আসে চরম সফলতা।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আগের প্রজন্মের মহৎ লেখকদের চোখে অনুজপ্রতিম লেখকের নারীচরিত্র সৃষ্টির বিশিষ্টতা অভিনন্দিত হয়েছিল বলে লেখক তাঁর শ্রমকে সার্থক ভাবার সুযোগ পেয়েছেন। পঞ্চতপা পড়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জড়িয়ে ধরেছিলেন ওঁকে। অফিস থেকে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। বসুমতীতে প্রকাশিত কলঙ্কবতী নামে ছোট গল্পটি পড়ে প্রতিমা ঠাকুর প্রাণতোষ ঘটককে জানিয়ে ছিলেন কলঙ্কবতী চরিত্রস্রষ্টা তাঁকে কতখানি মুগ্ধ করেছে।

বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগের অনেকখানি সাফল্যই দাঁড়িয়ে আছে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী স্তম্ভের ওপর। তাঁর লেখা কাহিনী থেকে চিত্রনাট্য করতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা পাওয়া যায় সংলাপপর্বে। বয়স, কাল, শিক্ষা, সামাজিক স্তর এবং মানসিকতার বৈচিত্র্য নিয়ে তাঁর বিভিন্ন নারীচরিত্রের মুখে বসানো সংলাপ প্রসঙ্গে লেখক বললেন, 'লেখার মধ্যেকার নারীটিকে যখন কল্পনা করতে শুরু করি, গোড়ায় খানিকটা আবছা থাকলেও ক্রমে সে এত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেন মনে হয় আমার কানের কাছে সে নারী কথা বলছে। নারীর উক্তিই তো নারীচরিত্র গড়ার ভাইটাল ফোর্স। সেটি রচনায় মনঃসংযোগ যথাযথ হলে – সংলাপের অভিব্যক্তি – আমি যেমনভাবে সাজাতে চাইব তেমন ভাবেই চলে আসবে আমার কলমের ডগায়। তার কমনীয়তা, তার বলিষ্ঠতা, তার পবিত্রতা, এমনকি দরকার মতো তার যৌনতাও ছুঁয়ে যাবে তাঁর সংলাপে –যেমন নারীর একটি চাউনির বর্ণনাতেই মূর্ত করা যায় তার ভেতরের মানবীটিকে, সংলাপেরও থাকা দরকার সেই জোর। নারীর যেখানে যতটুকু আবেদন আছে তার সামান্যতমও উপেক্ষা করা প্রকৃত শিল্পীর ধর্ম নয়।'

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বহু নায়িকার ভূমিকায় রূপারোপ করেছেন বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম সারির অভিনেত্রীরা। লেখকের সেই সব নারীচরিত্র পরিকল্পনার সঙ্গে এখানকার অভিনেত্রীদের শিল্পী নৈপুণ্য কতখানি সংগতি রচনা করেছে – এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক বললেন, 'পঞ্চতপা উপন্যাসের সান্ত্বনা চরিত্রের সঙ্গে যথার্থ একাত্ম হতে দেখেছি অরুন্ধতী দেবীকে। সাত পাকে বাঁধায় অর্চনার চরিত্রকে সুচিত্রা সেন যেভাবে মূর্ত করে তুলেছেন তার তুলনা হয় না। দীপ জ্বেলে যাই-এর নায়িকার ভূমিকায়ও সুচিত্রা সেন অনন্যা। বেণুর (সুপ্রিয়া দেবী) সম্পর্কে এ কথা বলতে পারি ওর 'কাল তুমি আলেয়ার' লাবণ্য সরকারের ভূমিকা প্রসঙ্গে। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের সোনাবৌদি চরিত্রটি (কাল তুমি আলেয়াতেই) অনুরূপ আর একটি স্মরণীয় চরিত্রায়ণ। আপন সৃষ্টির এইসব পুনর্নির্মাণের মধ্যে দিয়ে আমি আমাদের অভিনেত্রীদের প্রতিভার সম্যক মান উপলব্ধি করতে পেরেছি ভিন্ন মাত্রায়।

'আমার উপন্যাসের খুব জনপ্রিয় নায়িকাদের কাউকে বাস্তব জীবনের কোন অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহ করেছি – দু-এক কথায় বলে ওঠা যাবে না।

'মনে আছে আমার পঞ্চতপার নায়িকার আদল তখনো অধরা রয়ে গেছে, চরিত্রটা আমার মনের মধ্যে অনেকটা গড়ে উঠেছে; তবু তার ব্যক্তিত্বকে কলমের আগায় চিত্রিত করতে পারছিলাম না ঠিকমত। জানি কাহিনীটা হবে জলের জীবন নিয়ে। জল হবে আমার নায়ক। নায়িকা যেন তৃষ্ণার্ত জমি। তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি ডি ভি সি, পাঞ্চেত, ময়ূরাক্ষী। নোট নিচ্ছি। মনের মধ্যে নায়িকার মুখটা এসেও ঠিক আসছে না। দানা বাঁধতে পারছে না। এমন সময় হঠাৎ স্ট্রাইক করল ক্যালেন্ডারের একটি নারীর ছবি – বিষণ্ণ, গভীর, গম্ভীর, দৃঢ় সংকল্প যার মুখের রেখায়। লেখায় এরপর নায়িকা প্রত্যক্ষ হল সহজেই।

'তাই বলছিলাম কোনখানে কোন প্রেরণা লুকিয়ে আছে, কতকিছুর মধ্যে ছড়িয়ে আছে – এক কথায় বলে ওঠা যায় না সবসময়।'

খুব ছোটবেলা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় ব্যষ্টি কিংবা সমষ্টিতে নারীকে যেভাবে দেখেছেন লেখক সেই দেখাটা তাঁর কাছে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনিই সমান গুরুত্বপূর্ণ লেখকের নিজের ভেতরকার শুভবোধ। 'যা আছে' তার সঙ্গে 'যা হলে ভাল হত' মিশিয়েই আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নারীচরিত্ররা। একেবারে অসহনীয় অবস্থা না হলে তাঁর মন কখনোই বিবাহ বিচ্ছেদে সায় দেয় না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, বিশেষ করে, ষাট সালের পর থেকে ডিভোর্সের মামলা বাড়ছে। মানুষের সম্পর্কের সংকট জটিলতর হচ্ছে। সেই জটিল সময়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের লেখায় ছেলে তার মার দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুর পর বলে, 'আমি এ কেমন যুগে বাস করছি বুঝতে পারছি না, আমার বাবা বেঁচে অথচ মা বিধবা।' এই সংকটের দায় থেকে নারী তো মুক্ত নয়।

আংশিক দেখা কিংবা শোনা মানুষের অধিকাংশ বিভ্রান্তির মূলে। এই দেখা পূর্ণতা পেলে মানুষের মহিমা প্রকাশ পায়। লেখককে উদ্বুদ্ধ করে সৃষ্টিতে। কাল তুমি আলেয়ার সোনাবৌ চরিত্রটির মূলে আছে এমনই এক প্রেরণাধন্য উদ্বোধন।

'অক্সফোর্ড মিশনে হস্টেলে থেকে পড়ি। আমার বয়স তখন একুশ। গিয়েছিলাম বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে। বন্ধু দিদি-অন্ত প্রাণ। দিদির বয়স সাতাশ/আটাশ। বিধবা। বিষণ্ণ জীবন। আমরা যাওয়ায় দিদি খুশি হয়েছেন বলে মনে হল না। উল্টে, দ্বিতীয় দিনের বিকেলবেলাতেই আড়াল থেকে শুনে ফেললাম আমাকে সেখানে হঠাৎ নিয়ে আসার জন্যে দিদি বন্ধুকে বকছেন। আমি ঠিক করলাম পরের দিনই চলে যাব। শোনার পর দিদি আমার বন্ধুকে আমার সামনেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন ? হঠাৎ কি হল যে ও চলে যেতে চাইছে ? আমি যে কাল তোকে বলেছিলাম সেটা কি ও শুনেছে ?' তারপর আমাকে বললেন, 'তুমি কি জানো কেন তোমাকে এখন হঠাৎ এখানে আনার জন্যে ওকে বকেছিলাম ? আমাদের এখানে ভীষণ রকমের বসন্ত হচ্ছে। আমরা পুকুরের জল পর্যন্ত ছুঁচ্ছি না। আজ যদি তুমি ফিরে যাও, সঙ্গে তোমার বন্ধুকে নিয়ে যাও, আমি যেতে দেব, তবে তার আগে আমাকে তোমার কথা দিয়ে যেতে হবে, পরে রোগের প্রকোপ থাকবে না যখন, তুমি সুনিশ্চিত আসবে।' কথাটা শোনার পর মনে হল ভেতর থেকে কেউ যেন আলো জ্বেলে দিল। বন্ধুর সেই দিদি পরে আমার লেখায় ফিরে এসেছে সোনাবৌদি হয়ে। কোমলে কঠোরে নারী চরিত্রের এই আলোকিত উদ্ভাস আমার লেখার চোখ খুলে দিয়েছে।'

সাক্ষাৎকার ঃ সুনীল দাশ

ফটো : ইন্দ্রজিৎ মিত্র

জাতীয় কংগ্রেসের শতবর্ষঃ নারীর ভূমিকা

শ্যামলী বসু

স্বদেশচেতনার বীজমন্ত্র নিয়ে কংগ্রেসের যাত্রা শুরু ১৮৮৫-র শেষভাগে। তখন বহুকালের অশিক্ষা আর কুসংস্কারের পাথর সরিয়ে নারীরাও এসে দাঁড়িয়েছিলেন পুরুষের পাশে। সংখ্যায় তাঁরা নগণ্য হলেও ভূমিকা পালনে ছিলেন অসামান্য। সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেছিলেন কেউ, কারও কণ্ঠ গর্জে উঠেছিল অন্যায়ের প্রতিবাদে, কারও কোমল হাতে উঠে এসেছিল আগ্নেয়াস্ত্র। স্বাধীনতা আন্দোলনের চিরস্মরণীয়া সেই নারীদের নিয়ে এই আলোচনা ইতিহাসের প্রায়-বিস্মৃত অধ্যায়টিকে আলোকিত করার প্রয়াস।



মহাত্মার সঙ্গে কথোপকথন রত সরোজিনী নাইডু

১৮৮৫ সনে বোম্বাইনগরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তবে কংগ্রেস গঠন কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। কারণ সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকেই এ দেশের শিক্ষিত মানুষের মনে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংস্কার ও অধিকার আদায় করার প্রশ্ন জেগে উঠেছিল। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্ব প্রস্তুতি চলেছে অনেক আগে থেকেই। অর্থাৎ কিনা বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে স্বাদেশিকতা, জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল দেশবাসীর মনে। অবশ্য এ চেতনার জন্যে ভারতবাসী পরোক্ষ ভাবে বিদেশী শাসকের কাছে ঋণী। কারণ এই স্বাদেশিকতা জাতীয়তাবোধের উৎস—উনিশ শতকের রেনেসাঁস যা পশ্চিম দুনিয়া থেকে এসে আলোড়িত করেছিল শিক্ষিত ভারতবাসীর মন।

রেনেসাঁসের মানবিকতাবোধের অনুপ্রেরণার প্রথম পর্ব মূলত সতীদাহ নিবারণ আর বিধবাবিবাহ প্রবর্তনার মধ্যে। দ্বিতীয় পর্বের মূল কথা ছিল স্বদেশচেতনা। সিপাহী বিদ্রোহের পরেই সেই চেতনা নতুন করে জ্বলে উঠল দেশবাসীর মনে, যার ফলে এক এক করে গড়ে উঠেছিল—হিন্দুমেলা, ন্যাশনাল লিগ, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি সংস্থা। ১৮৮৩ সনে আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখ শিক্ষিত তরুণরা কলকাতার অ্যালবার্ট হলে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন মারফত আহ্বান করলেন ন্যাশনাল কনফারেন্স, দেশের রাজনৈতিক সমস্যা আর প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করার জন্যে। এই যে অস্ফুট আকাঙ্ক্ষা তারই পরিপূর্ণ রূপ জাতীয় কংগ্রেস।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু এ কংগ্রেস লর্ড ডাফরিনের ভাষায়—'microscopic minority', দেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষের উদ্যমের ফসল। সেখানে মেয়েরা তখন কোথায়? তখনও কয়েক শতাব্দী ধরে মেয়েদের ঠাঁই অন্তঃপুরের আড়ালে। কুসংস্কার অশিক্ষা আর অজ্ঞতার সাধারণ উত্তরাধিকার নিয়েই মেয়েদের জীবন। সামাজিক অনুশাসনের চাপে জড় এবং পঙ্গু। লেখাপড়া শিখলে সুনিশ্চিত বৈধব্য। সতীদাহ নিবারণ বা বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে তাদের কোনোই ভূমিকা ছিল না, সে সামাজিক অধিকারও সহৃদয় পুরুষের কঠিন সংগ্রামের ফল।

তবু জীবনের স্বাভাবিক অগ্রগতি ঠেকানো দুঃসাধ্য বলেই ১৮৮৩ সনে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার ছাব্বিশ বছর পরে—স্নাতক হবার বিরল গৌরব অর্জন করে

ফেলেন দুই বাঙালিনী। অবশ্য এ ছিল নিতান্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সমাবর্তন ভাষণে দুই তরুণীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেও উপাচার্য মন্তব্য করেন—'The condition of female education....is still painfully backward.'

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধনে দেশের মেয়েদের এগিয়ে এসে কংগ্রেসে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া ছিল কল্পনাতীত ব্যাপার। তবু দেখা গেল—১৮৮৯ সনে, বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে, ১৮৮৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে পাঁচজন মহিলাকে। কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁরাও যোগ দিয়েছিলেন। নিতান্ত নগণ্য সংখ্যা হলেও, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে মেয়েদের যোগদান রীতিমত এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মেয়েদের সহযোগিতা কংগ্রেসে নতুন সম্ভাবনার সূচনা করল।

পরের বছর অর্থাৎ ১৮৯০ সনে, কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশন হল কলকাতায়। এবার বক্তৃতা মঞ্চে দেখা গেল এক বিদুষী বঙ্গললনাকে। তিনি প্রথম ভারতীয় মহিলা স্নাতকদ্বয়ের অন্যতমা, খ্যাতনামা মহিলা চিকিৎসক ডঃ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। ডঃ কাদম্বিনী সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, যখন কঠোর পর্দাপ্রথা আর অশিক্ষা, কুসংস্কার দূরে রেখে মেয়েরা দু একজন করে এগিয়ে আসছেন কংগ্রেসে যোগ দিতে, তখনই ১৮৯২ সনে এলাহাবাদে কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশনে সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে জানিয়ে দিলেন, সমাজ সংস্কারের সঙ্গে রাজনৈতিক অধিকারের সম্বন্ধ নেই। 'তাই বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহের অপ্রচলন, স্ত্রী শিক্ষার অনগ্রসরতায় পিছিয়ে থাকলেও আমরা রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হব কেন?' অতএব বিশেষ বিবেচনা করে কংগ্রেসের কার্য তালিকা থেকে সমাজসংস্কারের প্রশ্ন বাদ দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে দেশের নারী প্রগতির মত অতি প্রয়োজনীয় সমস্যাটিও বড় উপেক্ষিত হয়ে পড়ে। ফলে এ দেশের মেয়েদের সার্বিক উন্নতিও কিছু সময়ের জন্য ব্যাহত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। রাজনৈতিক অধিকার তখনই সম্পূর্ণ এবং সফল হয়, যখন তার সঙ্গে শিক্ষা আর জ্ঞানের সংযোগ ঘটে। কিন্তু অষ্টম অধিবেশনের সিদ্ধান্ত—এ দেশের মেয়েদের স্বাভাবিক অগ্রগতির পরিপন্থী হয়ে উঠেছিল।

অবশ্য যত বাধাই আসুক—এ দেশের মেয়েরা ধীরে ধীরে রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা জায়গা করে নিচ্ছিলেন। বিশেষ করে যেসব পরিবারের পুরুষেরা কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য



কস্তুরবা গান্ধী

ছিলেন বা একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন তাঁদের অন্দরমহলেও যুগের দাবি, দেশের প্রশ্ন ঢেউ তুলেছিল। কংগ্রেস তখন দেশের প্রধান এবং বলতে গেলে একমাত্র রাজনৈতিক মঞ্চ। রাজনীতিতে অংশ নেওয়া মানেই কংগ্রেসে যোগ দেওয়া।

শহর ছেড়ে দেশের গ্রামে গ্রামান্তরের মানুষের কাছে কংগ্রেসের বাণী পৌঁছে দিলেন গান্ধীজী এবং তাঁর অনুগত কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ।

জাতির জনকের উপযুক্ত সহধর্মিণী কস্তুরবা। মানবিক অধিকার অর্জনের দাবিতে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কস্তুরবা ছিলেন গান্ধীজীর অনুগামিনী। দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং ভারতবর্ষেও তিনি বারবার কারাবরণ করেছেন। অসহযোগ আন্দোলনে অস্পৃশ্যতা বর্জনে কস্তুরবা নিয়েছেন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। সত্যাগ্রহ আশ্রমের তিনি ছিলেন জননীস্বরূপা। জীবন থেকে সব রকম আরাম, বিলাস বর্জন করে, খাদির ব্যবহারে, চরকা কাটায় কস্তুরবা দেশের মেয়েদের সামনে রেখেছিলেন উজ্জ্বল এক দৃষ্টান্ত। ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে তিনি আবার বন্দী হন। বন্দী অবস্থায়ই তাঁর মৃত্যু ঘটে—তাই স্বাধীন ভারতের রূপ কস্তুরবা দেখে যেতে পারেননি।



নেলী সেনগুপ্ত

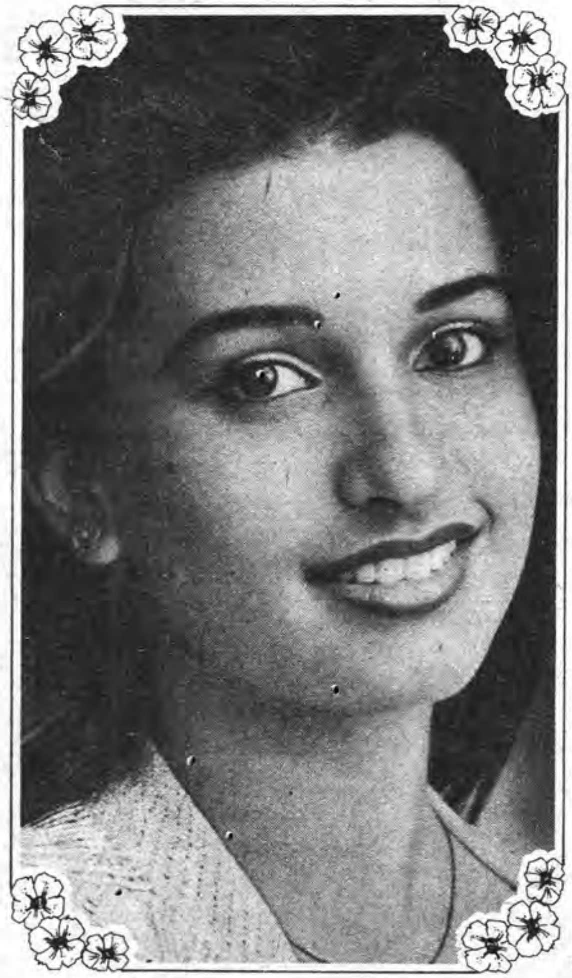
এলাহাবাদের নেহরুর পরিবার আর কলকাতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পরিবারের মেয়েরা বিশেষভাবে কংগ্রেসী আন্দোলনে যোগ দিলেন। এগিয়ে এলেন সরোজিনী নাইডু। বিদেশী সরকারকে চমৎকৃত করে দুই বিদেশিনী ভারতবাসীর স্বদেশচেতনাকে অভিনন্দন জানালেন। পরিণত হলেন কংগ্রেসী সমর্থকে। এমনকি কংগ্রেস অধিবেশনে সভানেত্রীর পদও অলঙ্কৃত করলেন তাঁরা। এঁদের একজন অ্যানি বেসান্ত, অপরজন নেলী সেনগুপ্ত। প্রথমজন অধ্যাত্মবাদী। থিয়সফিস্ট আন্দোলনের কর্মী হিসাবে এসে ভারতবাসীর রাজনৈতিক দাবিদাওয়ার পূর্ণ সমর্থক হয়ে পড়েন। অপরজনও ইংরেজ রমণী, বিবাহসূত্রে এদেশী, কংগ্রেসী নেতা দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের স্ত্রী। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় আর এক বিদেশিনীর নাম। তিনি ভারত-ভগিনী নিবেদিতা। নিবেদিতা বিপ্লববাদের আদর্শকেই চরম বলে মনে করলেও—কংগ্রেসী আন্দোলন-এর প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন। গোখলের আমন্ত্রণে নিবেদিতা যোগ দিয়েছিলেন বারাণসী কংগ্রেস অধিবেশনে ১৯০৫ সনে।

১৮৮৫ সনে কংগ্রেস গঠিত হবার পর থেকে—বিভিন্ন অধিবেশনে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক সমস্যার পর্যালোচনা করে, অবস্থার উন্নতির জন্যে নানা প্রস্তাব নেওয়া হচ্ছিল, কিন্তু সেসব কাজে পরিণত হবার কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছিল না—বিদেশী শাসকের বাঁরংবার হস্তক্ষেপের ফলে। এদিকে জাতিধর্ম নির্বিশেষে ভারত এক অখন্ড জাতীয় চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে দেখে শাসকশ্রেণী আবার এক কূট চাল চাললেন। লর্ড কার্জন শাসনের সুবিধার নামে বাংলাকে ভেঙে টুকরো করে দিলেন। এই বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল সারা বাংলাদেশ। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে নেতারা ডাক দিলেন বিলিতি দ্রব্য বর্জনের—বয়কটের।

১৯০৩ সনে মাদ্রাজ কংগ্রেসে 'বঙ্গভঙ্গ' প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করা হয়। কিন্তু ১৯০৫ সনের অক্টোবরে বঙ্গভঙ্গ রোধ করা গেল না যখন, তখন কংগ্রেসের বয়কট অর্থাৎ বিলিতিদ্রব্য বর্জনের ডাকে সাড়া দিয়েছিল সমস্ত দেশ, সাড়া দিয়েছিলেন দেশের মেয়েরাও। কারণ কবি মুকুন্দ দাসের গান শোনা যেত মেলায় মেলায়। 'ফেলে দাও রেশমি চুড়ি, বঙ্গ নারী কভু হাতে আর পরো না।' অলঙ্কার প্রিয় বাঙালি মেয়ে সেই চুড়ি ছুঁড়ে ভেঙে ফেলতেও কিন্তু তখন দ্বিধা করতেন না। বিলিতিবস্ত্র বর্জনের সঙ্কল্পে ফুলেফেঁপে উঠল গুজরাট আহমেদাবাদের দেশী কাপড়ের মিলগুলো। মেয়েরা অনেকেই মোটা শাড়ি পরতে আপত্তি করেননি। 'যদিও একবার

সূর্য্যের রশ্মি যখন অনবরত আপনার ত্বকের রঙ ময়লা করতে থাকে, আপনি কি ফর্সা হতে পারেন ?

আপনি জন্মেছিলেন এক বিশেষ রঙ নিয়ে। কিন্তু আজ তা অনেক পর্দা ময়লা হয়ে গেছে। আপনি জানেন — সূর্য্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি কত চট্ ক'রে রঙ ময়লা করে দিতে পারে। কিন্তু ওটাই রঙ ময়লা হওয়ার একমাত্র কারণ নয়। আপনার ত্বকের ভেতরে মেলানিন নামে এক রঞ্জক পদার্থ আছে, যা কিছু ত্বকে অন্যের তুলনায় অনেক বেশী ছড়িয়ে পড়ে — আর যত বেশী ছড়িয়ে পড়ে, ত্বক তত বেশী কালো দেখায়।



রঙ ফর্সা করার কি নতুন কোনো উপায় আছে ?

হ্যাঁ আছে ! এই প্রথম, বিজ্ঞানের এক নতুন আবিষ্কার — রঙ কালো করার প্রণালীকে নিয়ন্ত্রণ তো করেই, এমন কি তা বিপরীত দিকে চালনাও করে। ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী ! এ হ'ল রঙ ফর্সা করার ক্রীম।

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী কিভাবে কাজ করে ?

২ ভাবেঃ

ত্বকের ভেতরে ঃ ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী রঙ কালো করার প্রণালীকে বিপরীত দিকে চালনা ক'রে, ত্বকের ভেতরে স্নিগ্ধ-কোমল আর নিরাপদভাবে কাজ ক'রে — আপনাকে এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে।

ত্বকের বাইরে ঃ ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লীর বিশেষ 'রোদ এড়ানোর পর্দা' আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মিকে আটকে রঙ ময়লা হওয়া নিবারণ করে, অথচ আপনি সূর্য্যের যাবতীয় স্বাস্থ্যকর গুণ গ্রহণ করতে পারেন।

ফর্সা হবার জন্যে মাত্র ৬-সপ্তাহের কোর্সঃ

৬-সপ্তাহ নিয়মিত দিনে দুবার ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী মাখুন। প্রথমবার মাখার পর ত্বক হয়তো একটু চিন্‌চিন্ করতে পারে। এর মানে ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী কাজ করছে, ছ'সপ্তাহের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য সবার নজরে পড়বেই। নিয়মিত ব্যবহার করুন— আর ফর্সা হয়ে থাকুন।

ফর্সা হওয়া বা ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী
সম্বন্ধে আরোকিছু জানতে হ'লে
এঁর কাছে লিখুন ঃ
ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী অ্যাডভাইজার,
পোঃ অঃ বক্স নং; ৭৫৮,
বম্বে, ৪০০ ০২১।

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী
রঙ ফর্সা করার ক্রীম



আপনাকে নজরে পড়ার মত ফর্সা করে... প্রকৃতির নিজস্ব কোমল উপায়ে !

হিন্দুস্থান লিভারের
একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS FALOV 37 2416 BG

ধোওয়ার পর পাড়ের রঙ লেগে যেত শাড়ির গায়ে।' বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় জন্ম এমন এক বৃদ্ধা জানালেন 'আমার মা—অগুরু ছাড়া কোনো সুগন্ধি ব্যবহার করতে দেননি। বঙ্গলক্ষ্মী মিলের শাড়ি পরেছি বেশ মনে পড়ে।'

গৃহস্থ সংসারে দেশী জিনিস ব্যবহার করার প্রবণতার পিছনে ছিল সংসার কর্ত্রীদের উৎসাহ। লীলা মজুমদারের স্মৃতিকথায় দেখি—'দিশী জিনিস কিনতে হবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে দিশী জিনিস পাওয়া যাবে কোথায়! ভালো জিনিস তো নয়ই, মন্দ জিনিসও খুঁজে আনতে হয়। বড়জার মেজভাই মণিদা···সে ছিল দিশী জিনিস খুঁজে বার করবার পান্ডা। কোত্থেকে সব খেরোর মত মোটা খড়খড়ে কাপড়, ত্যাড়াবাঁকা পেয়ালা পিরিচ এনে দিত।····বাড়ি সুদ্ধ লোক এইসব জিনিস ব্যবহার করত।'

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জের চলেছিল বাংলাদেশের সীমা ছাড়িয়ে বাংলার বাইরেও। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের, কন্যা শান্তা দেবীর বিবরণে দেখি 'এলাহাবাদেও সভা, মিছিল, রাখীবন্ধন সব হত।····· রাখীবন্ধনের দিন আমরা অরন্ধন করলাম।'

১৯০৫-এর শেষে বারাণসী কংগ্রেস অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রসঙ্গ বেশ গুরুত্ব পেয়েছিল। কংগ্রেসী আন্দোলনের সমর্থক অনেক শিক্ষিত ভারতীয় পুরুষ—তাঁদের স্ত্রী এবং মেয়েদের নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন বেনারস কংগ্রেসে। প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐক্য-বন্ধন জোরদার করার ব্যাপারে মেয়েরাও নিয়েছিলেন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা।



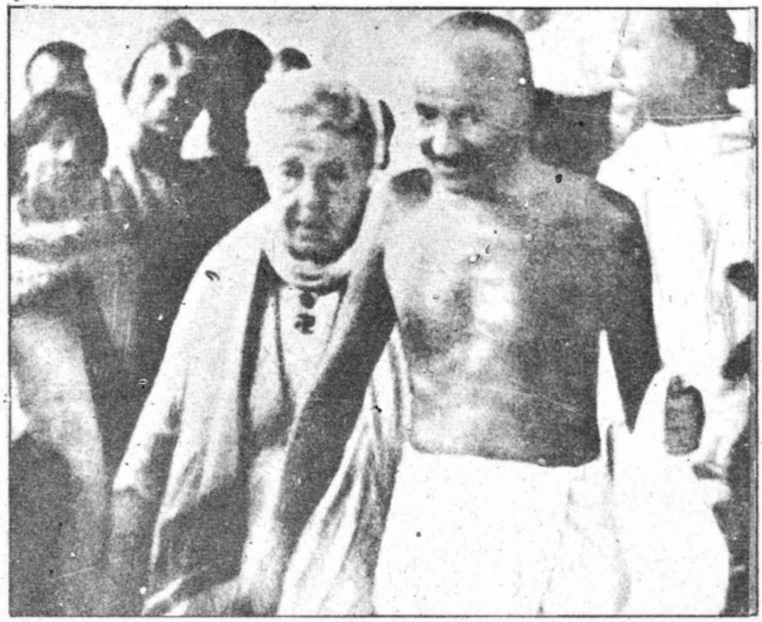
নিবেদিতা

কলকাতা থেকে নিবেদিতা যোগ দিয়েছিলেন এই অধিবেশনে। মাদ্রাজ থেকে এসে যোগ দিয়েছেন অ্যানি বেসান্ত। এসেছিলেন ঠাকুর বাড়ির দুই বিবাহিতা কন্যা। দুজনেই বাংলার বাইরে বিবাহিতা। সরলা দেবী চৌধুরানী আর সুদক্ষিণা দেবী। সরলা দেবী প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসে অংশ না নিলেও ১৯০১-এ কলকাতা কংগ্রেসে গীত হয়েছিল তাঁর রচিত 'অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণী আজি গাহ' এই গানটি। কেবল ভাবোদ্দীপক গান রচনাই নয়, উদয়াদিত্য উৎসব, প্রতাপাদিত্য উৎসব, বীরাষ্টমী পূজা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বাঙালি যুবকদের শরীরচর্চা আর বীরমন্ত্রে উদ্দীপিত করতে চেয়েছিলেন সরলা। এলাহাবাদ থেকে বাবা রামানন্দের সঙ্গে কাশীতে এসেছিলেন কিশোরী শান্তা। 'ভারতীর সম্পাদিকা বিখ্যাত সরলা দেবী তখন নববিবাহিতা হয়ে স্বামীর সঙ্গে এসেছিলেন। সোস্যাল কনফারেন্সে মহিলাদের মধ্যে বক্তা ছিলেন হেমন্তকুমারী চৌধুরী ও লেডি বিদ্যারমণ ভাই (গগনবিহারী মেহটার শাশুড়ী)।····রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী সুন্দরী সুদক্ষিণা দেবীও একজন বক্তা ছিলেন।'

বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন এদেশের মেয়েদের জীবনকে জড়তা, অজ্ঞতা আর কুসংস্কারের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে। এ জন্য প্রয়োজন ছিল—শিক্ষা, প্রকৃত শিক্ষা। সেই শিক্ষা দানের জন্য দরকার ছিল এক 'প্রকৃত সিংহীর', আয়ার্ল্যান্ডের মেয়ে মার্গারেট নোবলের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন সিংহীর তেজ আর কর্মক্ষমতা। মার্গারেটকে বিবেকানন্দ 'নিবেদিতা' নাম দিয়ে ভারতসেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। শিক্ষাব্রতীর দুরূহ দায়িত্ব নিলেও ভারতের স্বদেশী আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে পারেননি নিবেদিতা। আয়ার্ল্যান্ডের মেয়ে—তাই এ দেশে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ছিল তীব্র বিদ্বেষ। সমকালীন বিশিষ্ট কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর সখ্য। সহিংস বিপ্লববাদের তিনি ছিলেন সমর্থক, বিপ্লবীদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। অরবিন্দ ঘোষকে পন্ডিচেরী পাঠানোয় তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ বেলুড় মঠের শান্তিকে বিঘ্নিত করতে পারে একথা ভেবেই স্বামীজীর মৃত্যুর পরই খবরের কাগজের মারফত জানিয়েছেন, তাঁর কার্যকলাপের জন্য তিনিই দায়ী, বেলুড় মঠের সঙ্গে এ বিষয়ে কোনো সম্পর্ক নেই।

দেশে কংগ্রেসী আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হতে লাগল। বিদেশী শাসকের শাসনও সেই সঙ্গে কঠোর হয়ে উঠল। রাউলাট অ্যাক্ট, গোলটেবিল বৈঠক, আইন অমান্য, অসহযোগ, লবণ আইন ভঙ্গ ইত্যাদি আক্রমণ আর পাল্টা জবাবে সমগ্র দেশ ক্ষুব্ধ— দেশবাসীর মনেও দ্বন্দ্ব। অস্থিরতা। এর মধ্যে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতিতে ভাঙন ধরাবার জন্যে ইংরেজদের সযত্ন প্রয়াসেরও খামতি ছিল না।

মাদাম ব্লাভাৎস্কির শিষ্যা অ্যানি বেসান্ত এদেশে এসেছিলেন থিয়সফিস্ট হিসাবে, থিয়সফিক্যাল মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে। পরাধীন ভারতের স্বদেশচেতনা আর জাতীয়তাবোধের সঙ্গে কিন্তু নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন এই তেজস্বিনী বিদেশী কন্যা। মাদ্রাজে থাকাকালীন জাতীয়তাবোধের সমর্থনে জোরালো রাজনৈতিক প্রবন্ধাদি লিখে দেশনেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে একটি পত্রিকার স্বত্ব কিনে নিয়ে নতুন নাম দেন 'নিউ ইন্ডিয়া'। এই পত্রিকায় তাঁর আবেগপূর্ণ রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলো ইংরেজ সরকারের নজরে এলে তাঁর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। বোম্বাই, মধ্য প্রদেশে এ পত্রিকার প্রবেশও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশের মত ভারতেও যাতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়



মহাত্মা গান্ধী ও অ্যানী বেসান্ত

এজন্য তিনি হোমরুল লিগ গঠন করেন। নিউ ইন্ডিয়া হয়ে ওঠে এই আন্দোলনের প্রচারপত্র। অ্যানি বেসান্তের নির্ভীক মনোভাবে উত্যক্ত ইংরেজ সরকার তাঁকে, দুজন সঙ্গী সমেত ১৯১৭ সনে অন্তরীণ করে রাখার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দেশে বিক্ষোভ দেখা যায়—তার ফলে তিনি মুক্তি পান।

অ্যানি বেসান্তের রাজনৈতিক তেজস্বিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেশনেতাদের মনে সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। ১৯১৭ সনের কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে তাঁকে সভানেত্রীর পদে মনোনীত করা হয়। কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের উদ্বোধনে সমবেত কণ্ঠে বৈদিক মন্ত্র গান আর বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত গাওয়া হয়। সঙ্গীতশিল্পীদের পুরোভাগে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বোন সুগায়িকা অমলা দাশ। সভানেত্রীর ভাষণে অ্যানি বেসান্ত সরকারি দমন নীতির কঠোর সমালোচনা করেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি গান্ধীজীর অসহযোগ আর সত্যাগ্রহের বিরোধী ছিলেন। এর দ্বারা স্বরাজ লাভের আশা আদৌ সম্ভব নয় বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। আর একটি কারণে ১৯১৭ সনের কলকাতা কংগ্রেস স্মরণীয় হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সভানেত্রীর সঙ্গে অধিবেশনে যোগ দিতে আসেন বোরখা আবৃত সম্ভ্রান্ত মুসলমান ঘরণী, মহম্মদ আলি এবং শওকত আলির জননী। আলি ভ্রাতৃদ্বয় তখন কারাবরণ করেছেন। প্রকাশ্য কংগ্রেস অধিবেশনে বেগম আলির আগমন হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির একটা বড় পদক্ষেপ তাতে সন্দেহ নেই।

কংগ্রেসের অন্যতম নেত্রী সরোজিনী নাইডু ছিলেন মনেপ্রাণে গান্ধীবাদী। গোখলে তাঁকে রাজনীতির মধ্যে টেনে আনেন ১৯০২ সনে। '১৯১৪ সনে আমি তাঁকে (গান্ধীজী) দেখি, তিনি তখন মহাত্মা বলে খ্যাত হয়ে গেছেন।' গান্ধীবাদী কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার একেবারে বিপরীতে ছিলেন সরোজিনী তাঁর হাসিখুশি মেজাজ নিয়ে। কিন্তু স্বায়ত্তশাসন লাভ, আর সাম্প্রদায়িক ঐক্য বজায় রাখার প্রচেষ্টায় সরোজিনী ছিলেন গান্ধীজীর অনুগামিনী। ১৯২০-র চৌরিচৌরার ঘটনায় অহিংস আন্দোলন হিংস্র রূপ নিলে—সরোজিনী উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শনে ছুটে যান। গান্ধীজীর ছয় বছরের কারাদন্ড হলে তৎক্ষণাৎ তাঁর কাজের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিতে দ্বিধা করেননি সরোজিনী।

১৯৩০-এ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য যে দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়—তারই অভিব্যক্তি লবণ আইন অমান্য অভিযান। সবরমতী আশ্রম থেকে ৭৯ জন সত্যাগ্রহী সহ ডান্ডি অভিযানে সরোজিনীও



দেশবন্ধু ও বাসন্তী দেবী

ছিলেন তাঁর 'মহাত্মাজী'র পাশেই। এর আগে রাউলাট আইনের প্রতিবাদে দেশব্যাপী হরতালের দিনে গান্ধীজীর পাশে থেকে সরকারের বাজেয়াপ্ত বই বিক্রি করে তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন। ১৯৮১-তে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকেও তিনি গুরুর সঙ্গে যোগ দেন। তেজস্বিতা, নির্ভীকতা—আবার তার সঙ্গে মধুর রঙ্গপ্রিয়তা ছিল সরোজিনীর বৈশিষ্ট্য। সত্যাগ্রহের সময়—গ্রেপ্তার বরণের আগে—তিনি হাসতে হাসতে সঙ্গীদের ডাক দিচ্ছেন, 'জলদি, জলদি, টুথ ব্রাশ গুছিয়ে নিয়ে পুলিশের গাড়িতে উঠে পড়।' অসাধারণ বাগ্মী বলে খ্যাতি ছিল তাঁর। ১৯২৫-এ, কানপুর কংগ্রেসের অধিবেশনে সভানেত্রীর মুদ্রিত ভাষণের বদলে স্বভাবসুলভ বাগ্মিতায় মুগ্ধ করেন প্রতিনিধিদের। তাঁর ভাষণে বারবার জোর দেন হিন্দু মুসলিম ঐক্যের ওপর আর নির্দ্বন্দ্ব ঘোষণায় শোনা যায়—'দ্রুত স্বরাজ লাভই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আসল কাজ।'

প্রাক স্বাধীনতার যুগে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভানেত্রীর আসনে বসেছিলেন আর এক মহিলা। তিনিও বিদেশিনী। বিবাহ সূত্রে ভারতীয়। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের স্ত্রী নেলী সেনগুপ্ত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মত দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনও স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে ব্যারিস্টারি পেশা ছেড়ে দেন। বিদেশিনী স্ত্রী নেলী ঘোর দুর্দিনেও ছিলেন স্বামীর প্রকৃত সহধর্মিণী আর সহকর্মিণী। বর্মা অয়েল কোম্পানী আর বেঙ্গল আসাম রেলওয়ের ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনে যতীন্দ্রমোহন সর্বস্বান্ত হন। কিন্তু সব দুঃখ কষ্ট হাসিমুখে মেনে নিয়েছিলেন নেলী, এদেশের সীতা, সাবিত্রীর আদর্শেই। আইন অমান্য আন্দোলনে স্বামী কারারুদ্ধ হলে—নেলী তুলে নেন তাঁর কাজের ভার। এজন্য ইংরেজ সরকারের বিরাগভাজন হন। আর বিদেশী শাসকের অনেক কটূক্তি এবং সমালোচনা সহ্য করতে হয় তাঁকে। আইন অমান্য আন্দোলন যখন তুঙ্গে—১৯৩২ আর ১৯৩৩-এর কংগ্রেস অধিবেশন বানচাল করতে উঠে পড়েছিলেন ইংরেজ সরকার। ১৯৩৩-এর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য ইংরেজ শাসকের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে বারাণসী থেকে কলকাতায় আসছিলেন পন্ডিত মদনমোহন মালব্য। আসানসোলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আসানসোলে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি গ্রেপ্তার হন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মতিলাল নেহরুর পত্নী স্বরূপরানী। কলকাতার ৫৯টি পৌর উদ্যানে সভা করার ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা। অগত্যা ময়দানে সমবেত হন প্রতিনিধিরা। ৬০০ প্রতিনিধিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের মধ্যে ৭৫ জন ছিলেন মহিলা। কিন্তু জাতির স্বতঃস্ফূর্ত চেতনাকে দমিয়ে রাখা যায় না। এসপ্লানেড ট্রাম গুমটির শেডের নিচে ২৫০ জন প্রতিনিধি নিয়ে নেলী সেনগুপ্ত কংগ্রেসের ৪৭তম অধিবেশনের শুরু হল বলে ঘোষণা করলেন। বক্তৃতা আরম্ভ করা মাত্র জনৈক সহকারী কমিশনার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। নেলী সেনগুপ্তর নির্ভীকতা এবং ভারতচেতনার এক অবিস্মরণীয় উদাহরণ। তিনি সেদিন লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর সঙ্ঘবদ্ধ স্বাদেশিকতার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন।

নেহরু পরিবার কংগ্রেসী আন্দোলনে বিশেষভাবে জড়িয়ে ফেলেছিলেন নিজেদের। স্বরূপরানীও যে তার ব্যতিক্রম ছিলেন না বলাই বাহুল্য। দুই কন্যা বিজয়লক্ষ্মী আর কৃষ্ণাও স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। কারাবরণ করেছেন। ১৯৪৫-এ রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা হলে বিদেশী শাসকের প্রেরিত দুই প্রতিনিধিকে

অগ্রাহ্য করতে বলে—দূর আমেরিকার সভায় গর্জন করে উঠেছেন বিজয়লক্ষ্মী। 'আমি স্বাধীন ভারতের কথা বলতে এসেছি। আপনারা আমার কথা শুনুন।' এ প্রসঙ্গে বলা চলে যে, জওহরলালের পত্নী কমলাও অসুস্থ শরীরে মিছিলে যোগ দেবার সময় মূর্ছিত হয়ে পড়লে, যে ছেলেটি তাঁকে 'আন্টি' সম্বোধন করে বাড়িতে তুলে নিয়ে আসেন—তিনিই ফিরোজ গান্ধী, পরবর্তীকালে তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন এবং তাঁর একমাত্র কন্যার স্বামী।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন ব্যারিস্টারি পুরোপুরি ছেড়ে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন—সব ঐশ্বর্য অহঙ্কার পসার এককথায় ঠেলে দিয়ে, স্ত্রী বাসন্তী তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন—'তোমার এই সঙ্কটে আমিও তোমার পাশেই আছি। সব আরাম তুমি যদি ছেড়ে দিতে পার, তোমার স্ত্রী হয়ে আমি পারব না?' ১৯২০ সনে খদ্দরকে স্বরাজের প্রতীক বলে মেনে নেওয়া হলে বাসন্তী দেবী আর তাঁর দুই ননদ উর্মিলা এবং সুনীতিও পথের পাশে দাঁড়িয়ে খদ্দর বিক্রি করবার সময় গ্রেপ্তার হন। পরের দিন সংবাদপত্রে যাঁদের কথা উল্লেখ করে জানানো হল—'discharged with warning'।

স্বামী জেলে। চট্টগ্রামে প্রাদেশিক সম্মেলনের সভানেত্রী মনোনীত হলেন বাসন্তী দেবী। জোর যুক্তি দেখিয়ে স্পষ্ট গলায় দেশবাসীকে বুঝিয়ে বললেন—'অসহযোগ নয়। কাউন্সিলে আমাদের যেতে হবে। যতক্ষণ না কিছু অধিকার লাভ করছি, ততক্ষণ আমরা কাউন্সিলের প্রতি কাজে বাধা দেব।'

স্বদেশী আন্দোলনে প্রকাশ্যে অংশ নেওয়া ছাড়াও দেশবন্ধুর সহধর্মিণী হিসাবে সংসার ও সমাজের বিরাট কর্তব্য পালন করতে হত তাঁকে। অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক, প্রতিনিধিতে পূর্ণ থাকত তাঁর বাড়ি। তাঁদের তদারক, আপ্যায়নের ভার ছিল বাসন্তী দেবীর ওপর। এর ওপর ছিলেন সুভাষচন্দ্র। স্নেহ, মায়া, মমতায় প্রেরণায় বাসন্তী ছিলেন সুভাষের জননী সমান। সুভাষচন্দ্র বলতেন, আমি তো মার কাছেই রয়েছি।

১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর ক্ষোভ আর তিক্ততার তীব্র অভিব্যক্তি। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে (১৯৪২, ৭ ও ৮ আগস্ট) ভারত ছাড় সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পরই—ইংরেজ সরকার নেতাদের কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু সারা দেশ প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে নিজেরাই কর্মপন্থা স্থির করে নিয়ে—আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। যে আন্দোলনে পুরুষের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল দেশের মেয়েরাও। যাদের লক্ষ্য ছিল থানা দখল। রেল স্টেশন, ডাকঘর



সুচেতা কৃপালনী



বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত



ইন্দিরা গান্ধী

সরকারি ঘরবাড়ি পুড়িয়ে, টেলিগ্রাম টেলিফোনের তার কেটে দিয়ে—স্বদেশী সরকার গঠন। বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ও চুপ করে ছিলেন না। কঠোর হাতে দমন করার চেষ্টা হল এই বিপ্লব। পুরুষদের সঙ্গে প্রাণ দিলেন দেশের মেয়েরাও। কারাবাস, অত্যাচার, উৎপীড়ন, লাঞ্ছনা—বিশেষভাবে মেয়েরা ছিল যেন পাশবিকতার লক্ষ্য। অনেক দিন থেকেই চরকায় সুতো কাটা, খদ্দর পরা, খদ্দর বিক্রি করায় মেয়েরা নিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

১৯৩০ থেকে ১৯৪০ সনের মধ্যে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন বেশ কয়েকজন শিক্ষিত উৎসাহী মহিলা। চোখে যাঁদের ছিল দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সুচেতা কৃপালনী, লীলা রায়, অরুণা আসফ আলি। ১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হবার পর সাংগঠনিক কাজে এঁরা ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়।

দেশ স্বাধীন হবার পর জাতীয় কংগ্রেসের রূপও পাল্টে গেল। জাতীয় কংগ্রেস আর মাত্র একটা আন্দোলন বা মঞ্চ নয়, কংগ্রেস চিহ্নিত হল সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল হিসাবে। কংগ্রেস থেকে সৃষ্ট হল বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল। ক্রমে ১৯৪৭ থেকে ১৯৮৫—এই আটত্রিশ বছরের মধ্যে কংগ্রেসে মেয়েদের ভূমিকা রীতিমত জোরদার। কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির অরুণা আসফ আলি হলেন দিল্লির মেয়র। সুচেতা কৃপালনী ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর গুরুদায়িত্বে। সরোজিনী নাইডু হলেন রাজ্যপাল। তাঁর মৃত্যুর বেশ কিছু পরে তাঁর কন্যা পদ্মজা নাইডুও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছিলেন।

পদ্মজা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন মা সরোজিনীর আদর্শ অনুসরণ করে। প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের স্নেহভাজন পদ্মজা প্রত্যক্ষ রাজনীতির চাইতে সমাজসেবায় ত্রাণকাজে নিতেন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে কাজ করার সময় পশ্চিমবাংলার সংগঠনমূলক কাজে তিনি খুবই আগ্রহ দেখাতেন। সুখে দুঃখে তিমি এই রাজ্যের জনসাধারণের পাশে থাকতেন বলেই সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে উঠেছিলেন। আরও এক বিষয়ে পদ্মজা ছিলেন মায়ের মতই। সরোজিনীর মধুর কণ্ঠ আর বাগ্মিতার উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন পদ্মজা। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত স্বাধীন ভারতের নানা সমস্যা আর প্রশ্ন তুলে ধরলেন বিশ্বের দরবারে। তাঁর ওপর ন্যস্ত হল রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত, ইংল্যান্ডের হাইকমিশনারের দায়িত্ব। ভারতের সম্মান তিনি অনেক উঁচুতে তুলে ধরেছিলেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের সভানেত্রী মনোনীত হয়ে।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে কংগ্রেসে সব চাইতে বিশিষ্ট মহিলা ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী—একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বহির্বিশ্বে ভারতের মর্যাদা বজায় রাখার প্রশ্নে ইন্দিরা দ্বিতীয় রহিত। কংগ্রেসের সভানেত্রী, বেতার ও তথ্যমন্ত্রী এবং পরে এক বিশাল দেশের প্রধানমন্ত্রী—সব ভূমিকাতেই ইন্দিরা ছিলেন রীতিমত পারদর্শিনী। বর্তমানে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর পরিচিতি কেবল কংগ্রেস নয়, ইন্দিরা কংগ্রেস বলে।

এই নিন—হেয়ার রিমুভার সম্বন্ধে যাবতীয় খবরাখবর, যা আপনি জানতে চাইতেন!

হাতে পায়ে লোম থাকাটা আমার ভাল লাগে না। কিন্তু ওগুলো সাফ করতেও তো ভয় পাই—পাছে বেশি ঘন হ'য়ে দ্রুত বেড়ে না ওঠে!

এটা পুরো নির্ভর করছে—কি উপায়ে আপনি লোম সাফ করবেন! যদি ক্ষুর চালান, তাহলে হ্যাঁ, লোম সত্যিই দ্রুত বেড়ে উঠবে। আর সেই জায়গাটি হ'য়ে যাবে খুব খরখরে—ছিঃ! কিন্তু গোদরেজ হেয়ার রিমুভার ব্যবহার করলে তা হয় না। কারণ, এটি নারীসুলভ কোমলতায় আপনার হাত, বগোল, পা এমন কি মুখেরও সব লোম মোলায়েম ভাবে তুলে দেয়।

কিন্তু লোম তুলতে গেলে ব্যথা হবে না তো?

এটাও নির্ভর করছে—কি উপায়ে আপনি তা করবেন। ওয়াক্সিং-এ ব্যথা হবেই কারণ এটি টান মেরে লোম উবড়িয়ে আনে—উঃ! গোদরেজ হেয়ার রিমুভার দিয়ে লোম এমনই মোলায়েম ভাবে উঠে যায় যে আপনি কিছু টেরই পাবেন না।

একদিন আমার বান্ধবীকে লোম ওঠাতে দেখলাম—তার ত্বক লাল হ'য়ে সেখানে দাগ পড়ে গেল ...

অতি কোমল ত্বকের ওপর ঠিক এই প্রতিক্রিয়াই স্বাভাবিক—বিশেষ ক'রে ওয়াক্সিং-এর মত কড়া পদার্থ ব্যবহার করলে। কিন্তু গোদরেজ হেয়ার রিমুভার-এ মেশানো আছে এক বিশেষ হলুদ—ত্বকের স্বাভাবিক কণ্ডিশনার। ফলে, এই হেয়ার রিমুভার অবাঞ্ছিত লোম সাফ করার সাথে সাথে ত্বককে রাখে কোমল ও মোলায়েম।

হেয়ার রিমুভার-এ চারিদিক নোংরা আর সময় নষ্ট—নয় কি?

গোদরেজ হেয়ার রিমুভার-এর সঙ্গে থাকে নিজস্ব অ্যাপ্লিকেটর। এ দিয়ে আপনি হেয়ার রিমুভার লাগান—সেটা কিছুক্ষণ রাখুন—আর মুছে ফেলুন, ব্যস! দেখলেন তো—কাজটা কেমন সহজ! অন্যদিকে, ওয়াক্সিং মানে চট্‌চটে মোম, কাপড়ের পটির ঝঞ্ঝাট আর প্রচুর সময় নষ্ট—কী বিরক্তিকর নোংরা কাজ!

হেয়ার রিমুভার-এর গন্ধ অতি বিশ্রী—নয় কি?

গোদরেজ হেয়ার রিমুভার-এ অন্যান্য হেয়ার রিমুভারের মত বিশ্রী রাসায়নিক দুর্গন্ধ নেই। বরং এতে পাবেন এক মিষ্টি সুবাস!

আর দেরী কিসের? আপনি এখন আস্তিন ছাড়া চোলি-ই পরুন বা সুন্দর স্ট্র্যাপলেস্ ড্রেস! তবে হ্যাঁ, সবার প্রথমে আনুন—গোদরেজ হেয়ার রিমুভার প্যাক।



দি ইন্দো-সোভিয়েত কাল-চারাল সোসাইটি এবং দ্য ফ্রেন্ডস অব দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন সংস্হা দুটির পক্ষে সম্প্রতি কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সংগে খ্যাতনাম্নী গায়িকা, অভিনেত্রী ও ক্যাল-কাটা ইয়ুথ কয়্যারের পরি-চালিকা শ্রীমতী রুমা গুহ-ঠাকুরতা মস্কো ঘুরে এলেন। বর্তমান রচনায় তিনি মস্কো ভ্রমণের কিছু অভিজ্ঞতা ও নিজস্ব উপলব্ধির কথা জানিয়েছেন —

আমার সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ





রুমা গুহঠাকুরতা

আমি প্রথমবার সোভিয়েত ইউনিয়নে যাই ১৯৭১ সালে। ইন্দো-সোভিয়েত কালচারাল সোসাইটির তিনজন প্রতিনিধির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি ছিলাম আমি। এছাড়া বাকি দুজন ছিলেন হিন্দি ফিল্মজগতের খ্যাতনামা গীতিকার বম্বের শ্রীপ্রেম ধাওয়ান, অপরজন হলেন দক্ষিণী ফিল্মিজগতের সুপ্রসিদ্ধ সংগীত পরিচালক মাদ্রাজের শ্রীএম· বি· শ্রীনিবাসন।

অগাস্ট মাসের যে তারিখটিতে আমরা দিল্লি-থেকে মস্কোর পথে রওনা হয়েছিলাম সেই দিনটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওইদিনে আমাদের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট লিওনিদ ব্রেজনেভ-এর সঙ্গে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। প্রেমজী, আমাদের প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন। প্লেনে তিনি আমার পাশে বসেছিলেন। হঠাৎ তাড়াতাড়ি করে কী যেন একটা লিখলেন, একটুখানি পরে আমাকে হিন্দিতে বললেন, "রুমাজী আমি এই ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া উপলক্ষে একটি কবিতা লিখেছি। আমি পড়ছি, শুনুন, পরে কেমন লাগল মতামত দেবেন।" সত্যিই কবিতাটি অপূর্ব হয়েছিল!

মস্কোর পথে আমাদের প্রথম যাত্রাবিরতি হয়েছিল 'তাসখন্দে'। সেখানে আমরা ফিল্ম স্টুডিও দেখলাম; শিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হল, উভয় তরফের মতামত বিনিময় করলাম। প্রেমজী, তাঁর কবিতাটি পাঠ করে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রেমজীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কবিতাটিতে আমি গানের সুর দিয়ে আমাদের 'ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার'-এর জন্য ব্যবহার করতে পারব কিনা! উনি সানন্দে অনুমতি দিলেন। আমি কলকাতায় ফিরে আসার পরে ওয়াই· এস· মুলকি কবিতাটিতে সুর দিয়েছিলেন।

জীবনের সব জিনিসই প্রথম দর্শনে যেভাবে মনের মধ্যে প্রভাব ফেলে পরে তাকে কখনই মন থেকে মোছা যায় না। প্রথমবারের পরে আমি যখনই মস্কোতে গিয়েছি তখনই রেড স্কোয়ার-এ যেতে ভুলিনি, মস্ স্টুডিও দেখতে

আছে। আমি নিশ্চিত যে, অনেকেই আইজেনস্টাইনের ক্লাসিক ফিল্ম "Battleship Potempkin' ছবিটির কথা মনে করতে পারছেন। ওডেসাতে ইওরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একটি অপেরা হাউস আছে। যদিও আমরা এই অপেরা • হাউসটির ভেতরের অপরূপ স্থাপত্যশিল্প দেখতে পারিনি। আমরা ওখানে একদিন 'ফিলহারমোনিয়া অর্কেস্ট্রা থিয়েটারে' রাশিয়ার একজন বিখ্যাত পিয়ানোশিল্পীর পিয়ানো বাদন শুনতে গিয়েছিলাম। এই থিয়েটার হাউসটি বহু প্রাচীন, কিন্তু খুব যত্ন করে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। তবে সব থেকে ভাল সময় কেটেছিল বাচ্চাদের সঙ্গে তাদের 'পায়োনীয়ার ক্লাবে'। ক্লাবটি একেবারে সমুদ্রের ধারেই অবস্থিত। ওখানকার আবহাওয়া এত মনোরম যে, বাচ্চাদের সত্যি সত্যিই পড়াশোনায় মন বসে যায়। আমরা তাদের মিউজিয়াম, ক্লাসরুম, খেলাঘর এবং তাদের প্রেক্ষাগৃহ দেখলাম যেখানে তারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে ও সিনেমা দেখে।

'নিপ্রো' নদীর ধারে অবস্থিত 'কিয়েভ' একটি অপূর্ব শহর। 'নিপ্রো' হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় দীর্ঘতম নদী। 'কিয়েভ' শহরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতি রমণীয়। তুষারমৌলি পাহাড় এবং চিরসবুজ উপত্যকার সম্মিলনে শহরটির আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এ বছরে আমি একটি নতুন জিনিস দেখলাম যা আমি ১৯৭১ সালে দেখিনি। সেটি হল একটি নতুন মিউজিয়াম। এটিকে যুদ্ধের মিউজিয়াম বলা যেতে পারে। যে অসমসাহসী যোদ্ধারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মাতৃভূমি রক্ষার্থে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাঁদের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে এই মিউজিয়ামটি করা হয়েছে। এর প্রধান প্রবেশদ্বারে একটি বিশাল, মহান, গাম্ভীর্যময় মূর্তি আছে। মূর্তিটি কংক্রীট আর স্টিল দিয়ে তৈরি। উচ্চতায় ১০২ মিটার লম্বা। আমরা মিউজিয়ামটির ভিতরে গিয়ে সমস্ত মূল স্মারকগুলি দেখে এলাম।

আমার বিগত ভ্রমণকালে আমি ওদের অপেরা হাউসে ব্যালে দেখেছিলাম। যদিও এই অপেরা হাউসটির এবছর সংস্কার করা হচ্ছিল তাহলেও আমাদের 'ডন কুইক্সোট' ব্যালেটি দেখান হল। এরপর আমরা বাচ্চাদের জন্যে একটি ব্যালে শিক্ষণকেন্দ্রে গিয়েছিলাম। এখানে পাঁচ বছর থেকে ছয় বছর বয়সের মধ্যে ভর্তি হতে হয়, এবং আট বছরের কোর্স। আমরা প্রত্যেকটি ক্লাস ঘুরে ঘুরে দেখলাম। ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র-ছাত্রীরা তো দারুণ নাচছিল! আমার স্মৃতির পটে অমনি একটি ছবি ভেসে উঠল। আমিও তো আমার ছেলেবেলায় আলমোড়াতে উদয়শংকর কালচার সেন্টারে এমনিভাবেই নাচ শিখতাম! আমরা তাদের লোকনৃত্যও দেখলাম। এই লোকনৃত্যের ধারাটি পৃথিবীতে বিরল বলা চলে।



দুজন মহিলা সাংবাদিককে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন রুমা গুহঠাকুরতা

এই ভ্রমণকালে যে সুরটি বার বার মনের বীণায় অনুরণিত হচ্ছিল, যে উপলব্ধিটি মনকে ভালবাসায় আপ্লুত করছিল তা হল ভারত-সোভিয়েত দেশের মধ্যে অকৃত্রিম সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন! এই দৃঢ় বন্ধনই পৃথিবীতে শান্তির অগ্রদূতের ভূমিকা নিতে পারবে। রাশিয়া প্রত্যেকটি যুদ্ধে এত বিপুল সম্পদ হারিয়েছে যে, তারা এখন প্রচণ্ডভাবে শান্তিকামী হয়ে উঠেছে।

বেশিরভাগ মিটিংয়েই প্রধান আলোচ্য বিষয় থাকত বিশ্ব-শান্তি। সুতরাং আমাকে যখন গান গাইতে বলা হত, আমি প্রেম ধাওয়ান লিখিত "আমান কে হাম রাখওয়ালে সব এক হ্যায়...." এই গানটি গাইতাম (গানটি অতি সম্প্রতি ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যারের জন্য শিবদাস ব্যানার্জি অনুবাদ করে দিয়েছেন "শান্তির দূত মোরা সবাই—মোরা এক সব....")।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশ থেকে গিয়েছি বলে হয়তো রাশিয়ানদের আরও বেশি করে আকর্ষণ করতাম। সাধারণ রাশিয়ান নাগরিকরা গুরুদেবকে একজন সাধারণ বাঙালির মতই চেনেন। তাঁর প্রত্যেকটি লিখনকর্মই প্রতিটি আঞ্চলিক রাশিয়ান ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

রাশিয়ানরা এত বেশি সচেতন যে, তাঁরা আমাদের ভারতভূমি, তার প্রতিটি প্রদেশ, প্রাদেশিক আচার আচরণ এবং ভাষা সম্পর্কে বিশদভাবে খোঁজ খবর রাখেন। আমাদের যিনি রাশিয়ান দোভাষী ছিলেন, তিনি তামিল, কানাড়ী, বাংলা, হিন্দি, উর্দু এবং গুরুমুখী (পাঞ্জাবি) ভাষায় অনর্গল ভাবে কথা বলতে পারতেন।

এবছর ফ্যাসিবাদ বিরোধী উৎসবের চল্লিশতম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এই উপলক্ষে রাশিয়াতে একবছর ধরে উৎসব চলবে। আপন জন্মভূমি রক্ষার জন্যে যাঁরা যুদ্ধে প্রাণ হারিয়ে শহিদ হয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে। এর পরে আগামী জুলাই'৮৫-তে আন্তর্জাতিক যুববর্ষ উপলক্ষে তারা আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করছে।

আমি আগে দু বারই অগাস্ট মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নে এসেছিলাম, তখন এদেশে বসন্তকাল চলছিল। ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে ধরাভূমি ফল ফুলের বর্ণালী বাহারে অপরূপ সজ্জায় সেজেছিল। রাশিয়ার বসন্তকালীন নিসর্গ-প্রকৃতির বর্ণাঢ্য ছবিটি আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে রয়েছে। এবার আমার আরেকটি আলাদা অভিজ্ঞতা হলো। এ-বছর যখন গিয়েছিলাম তখন মস্কোতে মাইনাস ১ ডিগ্রী টেম্পারেচার চলছে, তখন পর্যন্ত তুষারপাত অব্যাহত ছিল।

১১ এপ্রিল সকালে (মস্কোর রাত ১·৩০ মিনিটে) আমি আর সুব্রতবাবু, এরোফ্লোটের প্লেনে করে সোজা কলকাতায় এসে নাবলাম। একটি ছবির মত, স্বপ্নের মত স্বর্গরাজ্য ছেড়ে যখন কলকাতায় এসে পৌঁছলাম তখন মনে মনে খুবই আনন্দ হচ্ছিল। কারণ যতই সে ধূলিমলিন, হতাশাময়, বেদনাভরা দেশ হোক 'সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি'।

আছে। আমি নিশ্চিত যে, অনেকেই আইজেনস্টাইনের ক্লাসিক ফিল্ম "Battleship Potempkin' ছবিটির কথা মনে করতে পারছেন। ওডেসাতে ইওরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একটি অপেরা হাউস আছে। যদিও আমরা এই অপেরা হাউসটির ভেতরের অপরূপ স্থাপত্যশিল্প দেখতে পারিনি। আমরা ওখানে একদিন 'ফিলহারমোনিয়া অর্কেস্ট্রা থিয়েটারে' রাশিয়ার একজন বিখ্যাত পিয়ানোশিল্পীর পিয়ানো বাদন শুনতে গিয়েছিলাম। এই থিয়েটার হাউসটি বহু প্রাচীন, কিন্তু খুব যত্ন করে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। তবে সব থেকে ভাল সময় কেটেছিল বাচ্চাদের সঙ্গে তাদের 'পায়োনীয়ার ক্লাবে'। ক্লাবটি একেবারে সমুদ্রের ধারেই অবস্থিত। ওখানকার আবহাওয়া এত মনোরম যে, বাচ্চাদের সত্যি সত্যিই পড়াশোনায় মন বসে যায়। আমরা তাদের মিউজিয়াম, ক্লাসরুম, খেলাঘর এবং তাদের প্রেক্ষাগৃহ দেখলাম যেখানে তারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে ও সিনেমা দেখে।

'নিপ্রো' নদীর ধারে অবস্থিত 'কিয়েভ' একটি অপূর্ব শহর। 'নিপ্রো' হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় দীর্ঘতম নদী। 'কিয়েভ' শহরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতি রমণীয়। তুষারমৌলি পাহাড় এবং চিরসবুজ উপত্যকার সম্মিলনে শহরটির আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এ বছরে আমি একটি নতুন জিনিস দেখলাম যা আমি ১৯৭১ সালে দেখিনি। সেটি হল একটি নতুন মিউজিয়াম। এটিকে যুদ্ধের মিউজিয়াম বলা যেতে পারে। যে অসমসাহসী যোদ্ধারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মাতৃভূমি রক্ষার্থে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাঁদের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে এই মিউজিয়ামটি করা হয়েছে। এর প্রধান প্রবেশদ্বারে একটি বিশাল, মহান, গাম্ভীর্যময় মূর্তি আছে। মূর্তিটি কংক্রীট আর স্টিল দিয়ে তৈরি। উচ্চতায় ১০২ মিটার লম্বা। আমরা মিউজিয়ামটির ভিতরে গিয়ে সমস্ত মূল স্মারকগুলি দেখে এলাম।

আমার বিগত ভ্রমণকালে আমি ওদের অপেরা হাউসে ব্যালে দেখেছিলাম। যদিও এই অপেরা হাউসটির এবছর সংস্কার করা হচ্ছিল তাহলেও আমাদের 'ডন কুইক্সোট' ব্যালেটি দেখান হল। এরপর আমরা বাচ্চাদের জন্যে একটি ব্যালে শিক্ষণকেন্দ্রে গিয়েছিলাম। এখানে পাঁচ বছর থেকে ছয় বছর বয়সের মধ্যে ভর্তি হতে হয়, এবং আট বছরের কোর্স। আমরা প্রত্যেকটি ক্লাস ঘুরে ঘুরে দেখলাম। ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র-ছাত্রীরা তো দারুণ নাচছিল! আমার স্মৃতির পটে অমনি একটি ছবি ভেসে উঠল। আমিও তো আমার ছেলেবেলায় আলমোড়াতে উদয়শংকর কালচার সেন্টারে এমনিভাবেই নাচ শিখতাম! আমরা তাদের লোকনৃত্যও দেখলাম। এই লোকনৃত্যের ধারাটি পৃথিবীতে বিরল বলা চলে।



দুজন মহিলা সাংবাদিককে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন রুমা গুহঠাকুরতা

এই ভ্রমণকালে যে সুরটি বার বার মনের বীণায় অনুরণিত হচ্ছিল, যে উপলব্ধিটি মনকে ভালবাসায় আপ্লুত করছিল তা হল ভারত-সোভিয়েত দেশের মধ্যে অকৃত্রিম সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন! এই দৃঢ় বন্ধনই পৃথিবীতে শান্তির অগ্রদূতের ভূমিকা নিতে পারবে। রাশিয়া প্রত্যেকটি যুদ্ধে এত বিপুল সম্পদ হারিয়েছে যে, তারা এখন প্রচণ্ডভাবে শান্তিকামী হয়ে উঠেছে।

বেশিরভাগ মিটিংয়েই প্রধান আলোচ্য বিষয় থাকত বিশ্ব-শান্তি। সুতরাং আমাকে যখন গান গাইতে বলা হত, আমি প্রেম ধাওয়ান লিখিত "আমান কে হাম রাখওয়ালে সব এক হ্যায়...." এই গানটি গাইতাম (গানটি অতি সম্প্রতি ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যারের জন্য শিবদাস ব্যানার্জি অনুবাদ করে দিয়েছেন "শান্তির দূত মোরা সবাই—মোরা এক সব....")।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশ থেকে গিয়েছি বলে হয়তো রাশিয়ানদের আরও বেশি করে আকর্ষণ করতাম। সাধারণ রাশিয়ান নাগরিকরা গুরুদেবকে একজন সাধারণ বাঙালির মতই চেনেন। তাঁর প্রত্যেকটি লিখনকর্মই প্রতিটি আঞ্চলিক রাশিয়ান ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

রাশিয়ানরা এত বেশি সচেতন যে, তাঁরা আমাদের ভারতভূমি, তার প্রতিটি প্রদেশ, প্রাদেশিক আচার আচরণ এবং ভাষা সম্পর্কে বিশদভাবে খোঁজ খবর রাখেন। আমাদের যিনি রাশিয়ান দোভাষী ছিলেন, তিনি তামিল, কানাড়ী, বাংলা, হিন্দি, উর্দু এবং গুরুমুখী (পাঞ্জাবি) ভাষায় অনর্গল ভাবে কথা বলতে পারতেন।

এবছর ফ্যাসিবাদ বিরোধী উৎসবের চল্লিশতম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এই উপলক্ষে রাশিয়াতে একবছর ধরে উৎসব চলবে। আপন জন্মভূমি রক্ষার জন্যে যাঁরা যুদ্ধে প্রাণ হারিয়ে শহিদ হয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে। এর পরে আগামী জুলাই'৮৫-তে আন্তর্জাতিক যুববর্ষ উপলক্ষে তারা আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করছে।

আমি আগে দু বারই অগাস্ট মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নে এসেছিলাম, তখন এদেশে বসন্তকাল চলছিল। ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে ধরাভূমি ফল ফুলের বর্ণালী বাহারে অপরূপ সজ্জায় সেজেছিল। রাশিয়ার বসন্তকালীন নিসর্গ-প্রকৃতির বর্ণাঢ্য ছবিটি আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে রয়েছে। এবার আমার আরেকটি আলাদা অভিজ্ঞতা হলো। এ-বছর যখন গিয়েছিলাম তখন মস্কোতে মাইনাস ১ ডিগ্রী টেম্পারেচার চলছে, তখন পর্যন্ত তুষারপাত অব্যাহত ছিল।

১১ এপ্রিল সকালে (মস্কোর রাত ১·৩০ মিনিটে) আমি আর সুব্রতবাবু, এরোফ্লোটের প্লেনে করে সোজা কলকাতায় এসে নাবলাম। একটি ছবির মত, স্বপ্নের মত স্বর্গরাজ্য ছেড়ে যখন কলকাতায় এসে পৌঁছলাম তখন মনে মনে খুবই আনন্দ হচ্ছিল। কারণ যতই সে ধূলিমলিন, হতাশাময়, বেদনাভরা দেশ হোক 'সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি'।

নেমন্তন্ন

সুজন দাশগুপ্ত

সুব্রত আর আমার দুজনেরই ঘোরতর আপত্তি ছিল, কিন্তু গৌরকে টলানো গেল না। ওর সেই এককথা, সব্বার বাড়িতে এতবার নেমন্তন্ন খেয়েছি যে, একবার অন্তত তাঁদের না ডাকলে ভাল দেখায় না। গৌরকে অনেক বোঝালাম। একে আমরা ছাত্র, বিদেশে পড়ে আছি – চাল নেই চুলো নেই, তার ওপর ব্যাচেলর। কেউই নেমন্তন্ন-টেমন্তন্ন এক্সপেক্ট করে না আমাদের কাছ থেকে।

'বাজে বকিস না', গৌর বলল, 'টুলুবউদি – এই সেদিনই বললেন, কি গৌর ভালো রাঁধো শুনেছি, একবার খাওয়াও!'

ভারী ডেঞ্জারাস মহিলা তো! আমাকেও বার দুয়েক বলেছেন কথাটা। সেটা চেপে গিয়ে বললাম, 'যাঃ, নিশ্চয় ফাজলামি করেছেন, বয়েই গেছে ওঁর অ্যাদ্দূর এসে হাবিজাবি খেতে।'

'হোয়াট ড্যু মিন হাবিজাবি?' গৌর চটে উঠল, 'কী এমন বাজে রাঁধি আমি?'

এবার সুব্রত এগিয়ে এল আমার সমর্থনে, 'কী বলতে তুই কী বুঝিস! সুজন বলতে চাচ্ছে যে এটা তো আর আমজাদ আলির 'তাজ প্যালেস' নয় যে, পঁচিশ মাইল ঠেঙালেও যাওয়া সার্থক! দুটো মাছ-ভাত-ডাল খেতে আসতে খাটনিতে পোষাবে না।'

'তার ওপর এই ঘুপচি অ্যাপার্টমেন্টে বাচ্চাগুলো তো দমবন্ধ হয়ে মারা যাবে।'

'সেই, ওরা আবার একটু চঞ্চল, ছুটোছুটি করতে ভালবাসে', সুব্রত যোগ করল।

গৌর কিছুক্ষণ গুম মেরে থেকে বলল, 'তোরা ভীষণ স্বার্থপর। নেমন্তন্ন পেলেই তো লাফিয়ে উঠিস। কাউকে ডাকতে হলেই হাজার তালবাহানা।'

এবার সুব্রতর আঁতে ঘা লাগল। ছেলেটা সত্যিই নেমন্তন্ন খেতে বিশেষ ভালবাসে না, নিতান্ত একলা বাড়ি বসে থাকবে বলে সঙ্গ দেয়।

'বাজে বকিস না, লাফিয়ে আমি উঠি না তুই?'

'বেশ তুই না হয় লাফাস না, সুজন তো লাফায়।'

নেমন্তন্ন পেলে আমি একটু উৎসাহিত হই ঠিকই, কিন্তু কখনোই গৌরের মতো নয়। ও হচ্ছে পেটুক নাম্বার ওয়ান।

'রাঁধবে কে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'আমি।'

'বাসন ধোবে কে?'

'আমি, কিন্তু তোরা সাহায্য করবি।'

'আমি পারব না', সুব্রত সাফসাফ জানাল।

'কাগজের প্লেট আর কাপ। হাঙ্গামা থাকবে না তাহলে।'

'আর সাহানাবউদিকে ডাকা চলবে না। একে নেমন্তন্নের ঝক্কি তার ওপর গানের তান সহ্য হবে না আমার।' সুব্রত দৃঢ়ভাবে মতামত দিল।

'বারে, অনেকবার খাইয়েছেন যে উনি।'

'তার জন্য কি খেসারত দিইনি? প্রত্যেকবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাথা নিচু করে সঙ্গীতরসে ডুব মারতে হয়েছে। আর কী চাস?' সুব্রতর যে সাহানা-সঙ্গীতে অ্যালার্জি তা সবারই জানা।

'এটা কিন্তু ভারী অভদ্রতা হবে, সব্বাইকে ডাকব অথচ ......।' সুব্রতেরও বাঙালের গোঁ, না তো না-ই!

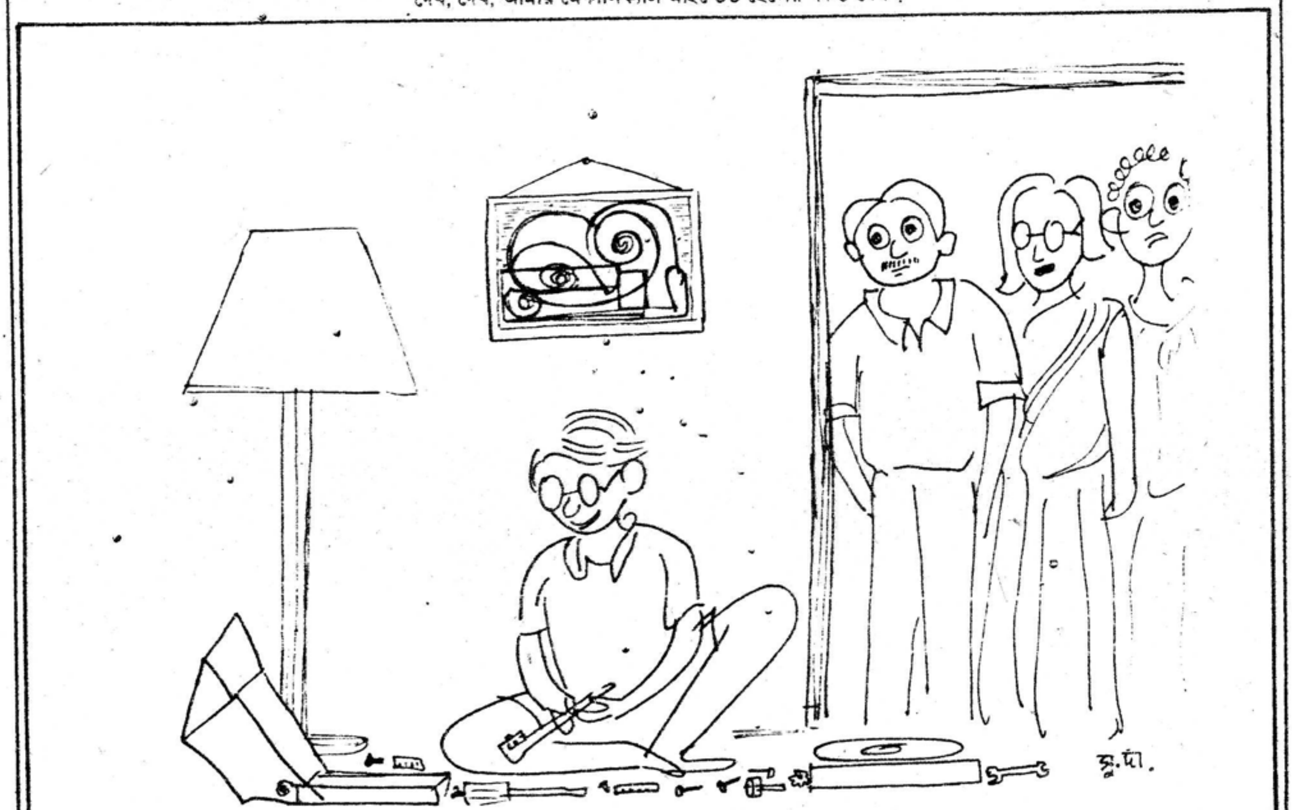
'এক কাজ কর গৌর, কায়দা করে আগে বার করে ফেল কোনদিন সাহানাদি ব্যস্ত – নেমন্তন্নে আসতে পারবেন না। সেদিন সব্বাইকে ডেকে ফেল। তাহলে নেমন্তন্ন করা হল, ঝক্কিও পোয়াতে হল না।'

'ভারী ছোটলোক তুই!' মুখে রাগ দেখালেও এই সমাধানে গৌরের খুব একটা আপত্তি মনে হল না।

'এই সঙ্গে টুলুবউদিকে বাদ দিয়ে দে', সুব্রত আরেকটা ফ্যাকড়া তুলল।

'একি মামদোবাজি নাকি? নেমন্তন্নটা তো টুলুবউদির জন্যেই করা।'

দেখ, দেখ, আমার মেকানিক্যাল মাইন্ডেড ছেলের কাণ্ড দেখ!



আপনার বাচ্চাকে দিন সেরেল্যাকের পুষ্টি!



চার মাস বয়েস হলেই দুধের সংগে সংগে আপনার বাচ্চার শক্ত খাবারেরও দরকার। আর এই সময়েই ওকে দিন সেরেল্যাকের পুষ্টি।

পুষ্টিকর গুণমান ঃ সেরেল্যাকের প্রতিটি ফীডের মধ্যেই আছে সব কিছু যা আপনার বাচ্চার পুষ্টির জন্যে দরকার। এতে আছে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, ভিটামিন আর খনিজ পদার্থ। বাচ্চাদের জন্যে ঠিক যেমনটি দরকার সেই অনুযায়ী এগুলি সুসম অবস্থায় থাকে।

অল্প সময়ে তৈরী ঃ বাচ্চার খিদে পাওয়ার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সেরেল্যাক তৈরী। এতে দুধ আর চিনি দেওয়াই আছে। আপনি শুধু ফোটানো জলে সেরেল্যাক গুলে নিন!

খেতে ভাল ঃ প্রথম শক্ত খাবার ধরাতে গেলে সেটা বাচ্চাদের কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা। সেরেল্যাকের স্বাদ বাচ্চাদের খুব পছন্দ। অতএব এটা দিয়ে সুরু করাই ভাল। তৈরী করার যে স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি টিনের গায়ে লেখা আছে সেই অনুযায়ী তা তৈরী করে আপনার বাচ্চাকে সুসম পুষ্টি যোগান।

বিনামূল্যে শিশুর বৃদ্ধিসূচী ঃ
আপনার বাচ্চার জন্যে একটা বৃদ্ধি পুস্তিকা এই ঠিকানায় চেয়ে পাঠান-
সেরেল্যাক, পোস্ট বক্স ৩
নিউ দিল্লী ১১০০১৮



Nestlé

সেরেল্যাকের মমতা: পুষ্টিতে সম্পূর্ণ-স্বাদে অপূর্ব

SAA/FSL/C/3799 BEN

'ওর বাচ্চাগুলো মহা ত্যাঁদড়, বাড়িঘর ধ্বংস করবে।'

'এঃ, ভারী তো রাজপ্রাসাদ তোর। এমনিতেই তো ভেঙে চুরচুর করছে, ধ্বংসের আর বাকি কী?'

'তাই বোঝাস ফেসেলকে!' ফেসেল হচ্ছে আমাদের বাড়িওয়ালা মহা খিটখিটে বুড়ো!

'বলবই তো, ভয় করি না কি?'

'আর জ্যাককে সামলাবে কে?' জ্যাক আর জ্যাক-গিন্নি আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের নিচের তলায় থাকে। দুজনেই দারুণ খ্যাপা। একটু জোরে কথা বা দৌড়ঝাঁপের আওয়াজ হলেই তেড়ে আসে।

'ঘাবড়াও মত, আমি ওদের আগেভাগেই বলে আসব। একদিনের জন্য যেন একটু মাফ করে দেয়।'

'গুড লাক!'

শুক্রবার কলেজ থেকে ফিরে তো আমি তাজ্জব! গৌরটার উৎসাহ আছে বলতে হবে। দশ মাইল ঠেঙিয়ে একটা চীনে দোকান থেকে একটা বিশাল লাউ আর পেল্লায় পেল্লায় সাইজের মুলো কিনে এনেছে। মুলোর ছেঁচকি আর লাউয়ের ঘণ্ট বানাবে। একটা রান্নার বইও যোগাড় করে এনেছে কোত্থেকে। সেটা ভুরুটুরু কুঁচকে পড়ছে, আর মশলার মাপজোক করছে।

'যাক এসে গেছিস, সুব্রতটা একেবারে গন কেস্!'

'কী ব্যাপার?'

'ব্যাপার আর কী, ওর 'আসছি, আসছি' করার মধ্যেই তিনটে রান্না নামিয়ে ফেললাম। বাবুর এখনো সময় হল না।'

সুব্রতর ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি ও তন্ময় হয়ে নিরো উল্‌ফ্ পড়ছে।

'এই সুব্রত, এবার ওঠ। গৌরকে সাহায্য করতে হবে।'

'ও-তো রান্না করছে, হেল্প করার তো কথা ছিল না।'

'ফাজলামি করিস না। রান্না বাদ দে, ঘরদোর তো একটু পরিষ্কার করতে হবে।'

সুব্রত চারদিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'দিব্যি আছে, ছেড়ে দে।'

'খেপেছিস! ধুলোবালি ভর্তি, কাগজপত্র ছড়ানো ... ...।'

'সো হোয়াট!'

'চুপ কর, গেট আপ।'

আমার ধমকে সুব্রত ঘ্যানঘ্যান করতে করতে উঠল। গৌর তাই দেখে একগাল হেসে বলল, 'উঠে পড়েছিস, ভাল হয়েছে। আমি আবার জ্যাককে বলতে ভুলে গেছি যে, এখানে আজ একটু হৈ-হল্লা হবে। তোরা নিচে গিয়ে একটু বলে আয় না।'

জ্যাক আর জ্যাকের বউ ঘোঁতঘোঁত করে বিয়ার গিলছিল, আর টি-ভি-তে ফুটবল খেলা দেখছিল। আমাদের দেখে বিরক্ত হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার?'

'ওপরে আজ একটু হৈ-হল্লা হবে', সুব্রত ঢাক গুড়গুড় না করে সোজাসুজি কথাটা পাড়ল।

'কেন?'

'পার্টি আছে।'

'পার্টি আছে তো পার্টি হাউস ভাড়া কর।'

আমি বললাম, 'না-না, সেরকম পার্টি নয়, ফ্যামিলি পার্টি। দু-একজন বাচ্চা আসবে, হয়তো একটু ছুটোছুটি করবে।'

'আই হেট নয়েজ।' জ্যাকের সায়েবী রক্ত গরম হয়ে উঠল।

'সো ড্যু আই', জ্যাক-গিন্নির প্রতিধ্বনি।

'আওয়াজ কি কারো ভাল লাগে নাকি, তবে বাচ্চাদের তো আর বেঁধে রাখা যায় না।'

'আই হেট চিলড্রেন' জ্যাক গজরাল।

'জ্যাকের বউ কুতকুত করে একটু তাকিয়ে বলল, 'মোড়ের মাথায় এক বেবি-সিটার থাকে। সেখানে রেখে এস।'

'তা কী করে হয়, ওরা তো আমাদের বেবি নয়।'

'সো হোয়াট?' জ্যাক প্রশ্ন তুলল।

এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদ।

'মেক ইট অ্যান অ্যাডাল্ট পার্টি। নো চিলড্রেন।' জ্যাক-গিন্নি পুরো সমস্যাটার সমাধান করে দিল এক মুহূর্তে।

নাঃ, এই খ্যাপাদের সঙ্গে বাতচিত করে কোনো লাভ নেই। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে' বলে ওপরের দিকে পা বাড়ালাম।

'গোলমাল বেশি হলে কিন্তু ভাল হবে না।' জ্যাক সতর্ক করল, 'দশটার আগে আওয়াজ বন্ধ হওয়া চাই।'

'মেক ইট নাইন থার্টি, তাড়াতাড়ি শুতে চাই আমি', জ্যাকের বউ এক্সট্রা তিরিশ মিনিটও বরদাস্ত করতে রাজি নয়।

'ব্যাটাদের বন্দুক-ফন্দুক নেই তো', সিঁড়িতে উঠতে উঠতে সুব্রত ফিসফিস করল, 'এরা তো আবার খেপে গেলেই গুলি চালায়।'

আমারও চিন্তা হচ্ছিল। একে সায়েব, তার ওপর যে রকম সকাল থেকেই মদ গিলছে, কিসে কী হয় কে জানে!

জ্যাকের কথা ভেবেই আমি আর সুব্রত বেশ ভালভাবেই প্রস্তুত হয়ে ছিলাম। স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে বাচ্চাদের নানানভাবে এনগেজ রাখতে হবে, খেলা দিয়ে, কাগজ পেন্সিল দিয়ে। কাগজ-পেন্সিলের সাপ্লাই প্রচুর, খেলা নিয়ে ঝামেলা। রেফ্রিজারেটরে কতগুলো পুরনো কমলালেবু ছিল, বলের অভাব সেগুলো দিয়েই পূরণ করা হবে সাব্যস্ত হল। আমি কতগুলো ম্যাচবক্স টয় কিনেছিলাম, কী কারণে মনে নেই। সেগুলোরও সদগতি হবে এই সুযোগে। প্রথমে আবির্ভূত হলেন সবাচ্চা টুলুবউদি ও বিনয়দা। বিনয়দা ঢুকেই বললেন, 'নন্তা-ভন্তা, তোমরা দুষ্টুমি করবে না, শান্ত হয়ে থাকবে, কেমন?'

টুলুবউদি প্রতিবাদ করলেন, 'আহা, এমন ভাব দেখাও যে, ওরা যেন সবসময়েই দুষ্টুমি করছে!'

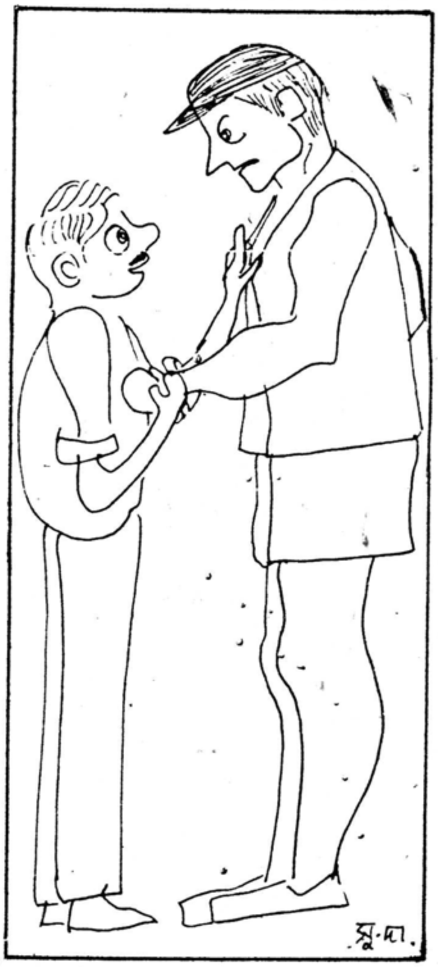
বিনয়দা টুলুবউদির দিকে তাকিয়ে একটা অ্যাপ্রিসিয়েটিভ হাসি ছাড়লেন তারপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'ওদের কোনো মেকানিক্যাল টয়-ঠয় দিতে পারো, নন্তাটা আবার খুব মেকানিক্যাল মাইন্ডেড।'

'অথবা ভিডিও গেম', টুলু বউদি যোগ করলেন।

'ইয়া-া-া!' বাচ্চাদুটো চেঁচিয়ে উঠল।

'শুধু টি ভি-তে চলবে?' সুব্রত বিরসভাবে প্রশ্ন করল।

'চলবে কী?' বিনয়দা টুলুবউদির দিকে একবার তাকালেন, 'আচ্ছা দেখ চেষ্টা করে।'



'শুধু থ্যাংকু নয় রে বাবা, মেনি মেনি থ্যাংকস্'

সুব্রত ওদের নিয়ে অদৃশ্য হতে না হতেই, পুঁটি আর তার বর কমলবাবু এসে হাজির। পুঁটিকে সুব্রত চেনে কলকাতা থেকেই, ওর পিসতুতো বোনের বন্ধু। পুঁটির মেয়ের বয়েস পাঁচ বছর। আধো আধো কথা বলতে ভালবাসে। সুব্রতর মতে পুঁটিও ঠিক এরকমই ছিল ছেলেবেলায়, ন্যাকার চূড়োমণি!

'তোমাদেল বালিতে লাল পেনথিল আথে?' প্রশ্নটা বোধহয় গাড়িতেই আবৃত্তি করতে করতে আসছিল। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই উদ্গারিত হল।

'নেই আবার,' গৌরের মুখে একগাল হাসি, 'লাল, নীল, সবুজ স-অ-অ-ব আছে। আমি তো জানি আমাদের মুন্নারানী আঁকতে ভালবাসে।'

আমি মনে মনে ভাবলুম থ্রি গন, টু টু গো। শ্যামলদার দুটো বাচ্চা, ব্যাস তারপর আর কারোর কিছু নেই। ও দুটোকে কিছু ধরিয়ে দিয়ে বসিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্তি। শ্যামলদার বাচ্চার বেলায় কিন্তু কোনো প্রবলেমই হল না। দুজনেই বই বগলে এসে হাজির। শ্যামলদা বললেন, 'ওদের জন্য কোনো চিন্তা কোর না। দুটো বালিশ দিয়ে ঘরের কোনায় বসিয়ে দাও, বই পড়বে।'

বাচ্চা থাকতে হলে এমন বাচ্চাই থাকা উচিত, কী ট্রেনিং! বই দুখানাও খাপখোলা তলোয়ার, 'ওয়ার অ্যান্ড পিস', আর 'ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট'।

'বই দুটো একটু কঠিন হবে না ওদের পক্ষে?' আমি একটু ভয়ে ভয়েই প্রশ্নটা করলাম।

'আঃ, কঠিন মনে করলেই কঠিন। ছেলেবেলায় কোন বয়সে লুকিয়ে লুকিয়ে শরৎচন্দ্র পড়েছ, মনে আছে?'

'তা ঠিক।'

'জয়ন্ত, সুমন্ত – কাকুর সংগে চলে যাও। চুপচাপ পড়বে, তারপর পড়া নিয়ে ডিসকাশন হবে। কেমন?'

জয়ন্ত-সুমন্ত কলের পুতুলের মতো ঢুক করে মাথা নাড়ল।

সবকিছুই ভারী চমৎকার চলছিল। গৌরটা বেড়ে রেঁধেছিল, সব্বাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমি চা-টা স্টোভে সবে চাপিয়েছি। হঠাৎ শুনি বিনয়দার উদাত্ত কণ্ঠস্বর, 'আরে দেখ, দেখ, আমার মেকানিক্যাল মাইন্ডেড় ছেলের কান্ড দেখ!'

গিয়ে যা দেখি তাতে তো চক্ষুস্থির। গৌরের নতুন রেকর্ড-প্লেয়ারের পার্টসগুলো চারদিকে খোলা অবস্থায় ছড়িয়ে আছে। নন্তা মন দিয়ে মুভিং আর্ম থেকে কার্ট্রিজটা খোলার চেষ্টা করছে। আমি তো হায় হায় করে উঠেছি, গৌরের মুখ সাদা। বিনয়দার কিন্তু কোনো দুশ্চিন্তা নেই।

'নন্তা বাবাই, পার্টসগুলো এবার জোড়া লাগিয়ে ফেল, কেমন? কাকুরা বোধহয় ভয় পাচ্ছে। কী, ভয় পাচ্ছ না কি?' আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা ছুঁড়লেন বিনয়দা।

'না, মানে লাগানোটা বেশ শক্ত হবে ছোট বাচ্চার পক্ষে।'

'খেপেছ, যদি খুলতে পারে, তাহলে লাগাতেও পারবে। আসলে ভীষণ কিউরিও-সিটি ওর।'

'হাই আই-কিউও', টুলুবউদি বললেন।

আমি এবার চট করে দেখে নিলাম টেবিলের ওপর আমার টেপ রেকর্ডারটা ইতিমধ্যে অক্ষত অবস্থায় আছে কিনা। না, সেটার কিছু হয়নি। যাক, গেছে গেছে গৌরের ওপর দিয়েই গেছে। যেমন আগ বাড়িয়ে নেমন্তন্ন করতে যাওয়া!

নন্তার এলেম আছে বলতে হবে। রেকর্ড-প্লেয়ারের চেহারাটা দিব্যি ফিরিয়ে আনল কিছুক্ষণের মধ্যেই। কয়েকটা পার্টস অবশ্য এক্সট্রা হয়ে গেল। ঠিক ধরা গেল না কোত্থেকে বেরিয়েছে, তা সব কি আর ঠিক হয়, হাজার হোক সার্টিফায়েড মেকানিক তো নন্তা নয়! কিন্তু যা করেছে তাই বা কম কী? 'শাবাশ' বলে বিনয়দা আর টুলুবউদি হাততালি দিলেন। আমরাও সকলে অল্পবিস্তর যোগ দিলাম। শুধু গৌরই ফ্যাকাসে মুখে গোঁজ হয়ে বসে রইল। ভন্তা এদিকে, বোধহয় হাততালি কুড়োবার লোভেই টেলিভিসনের নবটায় একটা মোক্ষম মোচড় লাগাল। সুব্রত কাছেই ছিল, হাত চেপে ধরল বটে, কিন্তু নবটাকে রক্ষা করতে পারল না। আচমকা সুব্রতর কাছে বাধা পেয়ে ভন্তা চ্যাঁ করে এমন একটা চিৎকার জুড়ল যে, আমরা সবাই চমকে উঠলাম। সুব্রত তো অপ্রস্তুতের একশেষ! টুলুবউদি অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে শেষপর্যন্ত শান্ত করলেন কোনমতে। সেই চিৎকার থামতে না থামতেই সুব্রতর ঘর থেকে চিৎকার শোনা গেল। ছুটে গিয়ে দেখি শ্যামলদার পুত্রদ্বয় বালিশযুদ্ধে মত্ত। একটা বালিশ ফর্দাফাঁই হয়ে ভিতরের ফোমগুলো সারা ঘরে ছেটাচ্ছে। তারই একটা টুকরো জয়ন্তের চোখে পড়ায় সে যুগপৎ লাফাচ্ছে ও চ্যাঁচাচ্ছে। কিন্তু পরাজয়ের ভয়েই বোধহয় যুদ্ধ থামাচ্ছে না। 'ওয়ার অ্যান্ড পিস'-টা পাশেই পড়ে আছে। সেখান থেকেই ইনস্পিরেশনটা এসেছে কিনা কে জানে! বীণাবউদি হাঁই হাঁই করে মাঝখানে গিয়ে পড়লেন। শ্যামলদা এদিকে আস্তিন গোটাচ্ছেন ছেলেদের উচিতমত একটা শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে। আমিও ভাবছি এসময়ে কী করা কর্তব্য। এমন সময় শুনি গৌর বলছে, 'খেয়েছে রে!' তাকিয়ে দেখি এই গোলমালের মধ্যেও মুন্নারানী সুব্রতর খাটের ওপর দাঁড়িয়ে লাল-নীল পেন্সিল দিয়ে দেয়ালকে চিত্র-বিচিত্র করছে।

'এই কী হচ্ছে ওটা,' সুব্রত ধমকে উঠল।

'পুঁটু বলল, 'আস্তে সুব্রতদা, ছোটদের ফ্রি এক্সপ্রেশনে বাধা দিতে নেই।'

'গোল্লায় যাক তো ফ্রি এক্সেপ্রেশন! এই মুন্না নাম খাট থেকে।'

পুঁটু রাগ করে বলল, 'এই রকম পরিবেশের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি গ্রো করবে কী করে!'

সুব্রত ভেঙিয়ে বলল, 'ক্রিয়েটিভিটি গ্রোথ! থাকতিস তো পাইকপাড়ায়, আমেরিকা এসে বড় বড় বুলি শিখেছিস!

কমলবাবু বউকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন, 'একি এতটুকুতে চটে যাচ্ছ কেন?'

গৌর ব্যাপারটাকে সামলাবার চেষ্টা করল একটু, 'আরে ছি ছি, কী হচ্ছে। চলুন চলুন বাইরের ঘরে গিয়ে বসি। সৃজন চায়ের কদ্দূর?'

আর চা! সুব্রত খেপে গেছে, 'থাম থাম গৌর, মেলা ভদ্রতা করিস না। রেকর্ড-প্লেয়ার ভাঙল, টি ভি ভাঙল, বালিশ ধ্বংস হল, দেয়াল নোংরা হল। এঁদের মুখ থেকে একটা শব্দ বেরোল না। শুধু একটা ধমক দিয়েছি, তাতেই ক্রিয়েটিভিটি কপচাচ্ছে!'

কথাটা শেষ হওয়ামাত্র চোখে আঁচল দিয়ে পুঁটু ডুকরে উঠল।

বউকে কাছে টেনে সুব্রতকে কমলবাবু বললেন, 'শুধু একটা ধমক? একটা বাচ্চা ছেলের হাত মুচড়ে দিয়েছ, লজ্জা করে না? চাইল্ড অ্যাবিউসার!'

'হোয়াট!' সুব্রত এমন একটা হুংকার ছাড়ল যে, বাচ্চারা সব একসংগে ভ্যাঁ করে উঠল। এদিকে বাইরের দরজায় লাথি পড়ছে। গৌর দরজা খুলতেই জ্যাক ধাক্কা দিয়ে ওকে সরিয়ে সোজা ভিতরে চলে এসেছে।

'ইউ! ইটস নাইন থার্টি, আউট এভরিবডি আউট!' ছ ফুট লম্বা, বেয়াল্লিশ ইঞ্চি ছাতি, রক্তচক্ষু সায়েব – যেন সিংহ গর্জন হচ্ছে। পার্টি তো ভাঙতেই বসেছিল, জ্যাকের মারমূর্তি দেখামাত্রই তল্পিতল্পা গুটিয়ে সবাই হাওয়া। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটল যে, জ্যাকও কেমন জানি হতভম্ব হয়ে গেল। তার ওপর সুব্রত গিয়ে জ্যাকের হাত ঝাঁকিয়ে বলল, 'থ্যাংক্ জ্যাক।'

লড়াইয়ের বদলে একি ধ্যাষ্টামো! মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হোয়াট ড্যু মিন 'থ্যাংক্?'

'শুধু থ্যাংক্ নয় রে বাবা, মেনি মেনি থ্যাংকস্।' সুব্রত প্রায় কোলাকুলি করে ফেলল জ্যাককে।

'ইউ আর ক্রেজি!' দুম দুম করে নিচে চলে গেল জ্যাক।

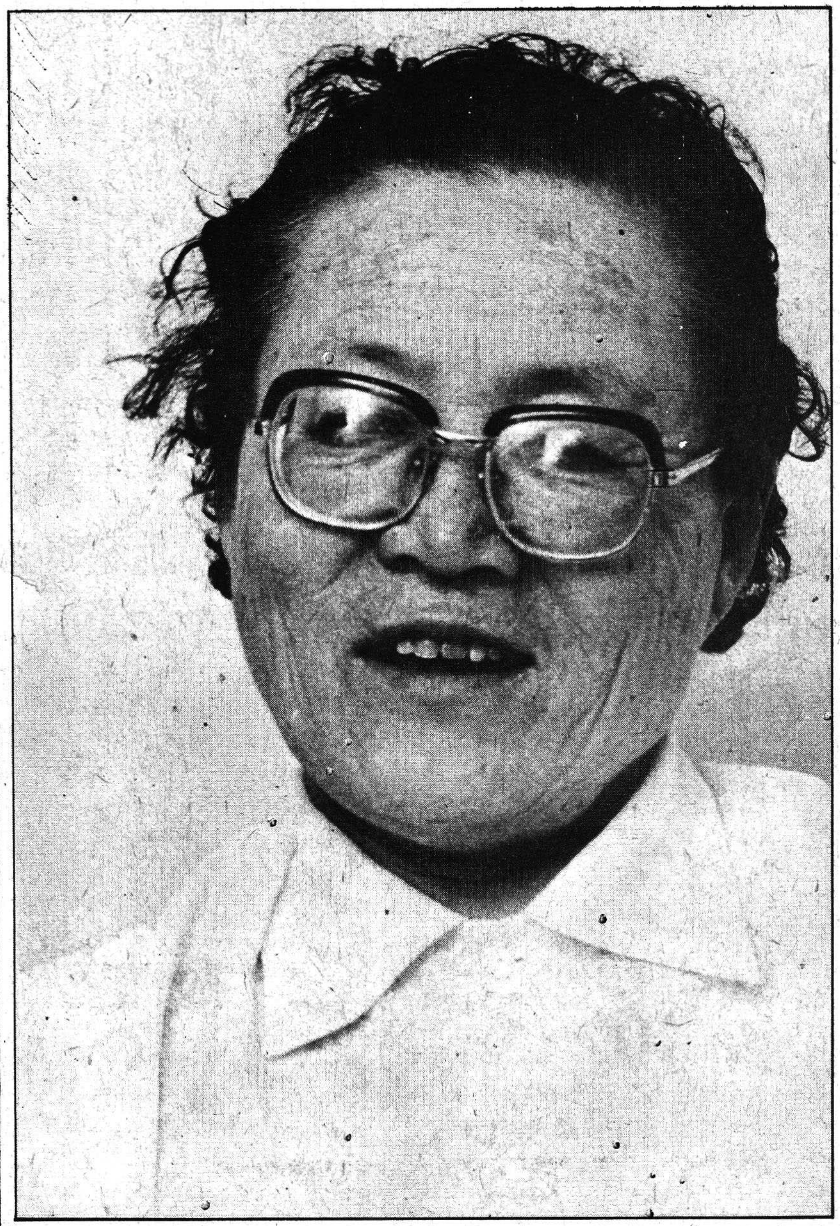
'গৌর কই?' সুব্রত জিজ্ঞেস করল।

আর গৌর! ঘরে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বসে আছে। বোধহয় নেমন্তন্নের ধাক্কা সামলাতে!

ছবি : সুজন দাশগুপ্ত

ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনীসের স্ত্রী

শ্রীমতী কুয়ো চিন্ লান



'আকাশ যেন পৃথিবীর ছাদ—তার অর্ধেক ভার বহন করে মেয়েরা, আর বাকিটা পুরুষের কাঁধে। পুরুষেরা মাঝেমাঝেই, যদিও বা আনমনে ফাঁকি দিয়ে ফেলে, মেয়েরা নৈব নৈব চ! তাই তো ভারসাম্যটা বাঁচাতে গিয়ে স্ত্রীজাতির উপর এত অস্বাভাবিক চাপ পড়ে—তাই তো সমাজের স্তরে স্তরে পুরুষ আর স্ত্রীর মাঝে এত বৈষম্য। ডক্টর কোটনীস খুব গভীর ভাবে এই অবিচার উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে এই ভার লাঘব করার চেষ্টা করেছিলেন।'

চীনা কিংবদন্তীর উদাহরণ দিয়ে শ্রীমতী কুয়ো চিং লান (Guo Quing Lan) স্মৃতির রোমন্থন করছিলেন। শ্রীমতী কুয়ো আমাদের কাছে মিসেস কোটনীস নামে পরিচিত—সেই বিখ্যাত মেডিকাল মিশনারী দ্বারকানাথ কোটনীসের স্ত্রী যিনি তিরিশের দশকের শেষভাগে চীনে যান।

অনেকের বোধহয় জানা নেই যে, চীন-জাপানের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের পরিস্থিতির মধ্যে, ভারত থেকে কংগ্রেস পার্টি এগিয়ে আসেন চীনের সাহায্যে। ১৯৩৮ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেন ডাঃ মোহনলাল অটলের নেতৃত্বে একটি মেডিকাল মিশন চীনে পাঠানো হবে—এঁরা যুদ্ধে আহত চীনা সৈনিকদের চিকিৎসা করবেন। এই দলে (team) যোগদান করলেন মহারাষ্ট্র থেকে ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনীস এবং বাংলাদেশ থেকে ভলান্টিয়ার হলেন ডাঃ বিজয়কুমার বসু। ডাঃ বসু বর্তমানে ভারতে ডাঃ কোটনীস মেমোরিয়াল কমিটি (Dr. Kotnis memorial Committee)-র সভাপতি। এই দলের সবাই পরে ভারতে ফিরে এসেছিলেন, শুধুমাত্র ডাঃ কোটনীসই চীন দেশের মায়া কাটাতে পারেননি।

ওদেশের মেয়েরা যে তাকে কী গভীর ভাবে আকর্ষণ করেছিল তার প্রমাণ আখেরে দিয়েছিলেন শ্রীমতী কুয়ো চিং লানকে বিয়ে করে। ডাঃ সুন ইয়াৎ সেন (Sun Yat Sen) এর স্ত্রী মাদাম সং চিং লিং (Song Qing Ling) এর প্রভাবও তাঁর উপর বিশেষ ভাবে পড়ে। চীনের মাটিতে পদার্পণ করার পর ক্যানটনে (Canton) এই মহিলাই ডাঃ কোটনীসকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। মাদাম সং সে সময়ে চীন ডিফেন্স লীগ (Chinese Defence League) -এর সভানেত্রী ছিলেন। বেস হাসপাতাল বলতে তখন ছিল কাঠ দিয়ে তৈরি কুঁড়েঘর, আর চিকিৎসার সরঞ্জামও খুব অল্প ছিল। সেইখানেই ডাঃ কোটনীস অপারেশন রুমে নার্স কুয়ো চিন লানের সংস্পর্শে আসেন। প্রতি পদক্ষেপেই চীনা নারীর অসীম কর্মদক্ষতা, ধৈর্য এবং সহ্যশক্তির পরিচয় পেয়ে ডাঃ কোটনীস নারী প্রগতির প্রয়োজন আরো বেশি করে উপলব্ধি করেন এবং তারই প্রভাব আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্রীমতী কুয়োর মধ্যে। তিনি ইয়ানানে (Yanan) International Peace Hospital -এ ডাঃ কোটনীসের সঙ্গে কাজ করে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন—তারপরে নার্সিং ছেড়ে মেডিকাল ট্রেনিং নেন। পরে সেই হাসপাতালেই স্বামীর অবর্তমানে ডিরেক্টর হন—(ডাঃ কোটনীস এই হাসপাতালের সর্বপ্রথম ডিরেক্টর ছিলেন)। নানা হাসপাতালে কাজ করার পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন গত বছরে—তাঁর শেষ দায়িত্ব ছিল দালিয়ান শিশু হাসপাতালের ডিরেক্টর হিসাবে। (Director, Dalian Children's Health Centre)।

কে বলবে শ্রীমতী কুয়োর বয়স প্রায় সত্তরের কোঠায়? গাড়ি থেকে নেমে হাতজোড় করলেন নমস্কারের ভঙ্গিতে—আরো চমকে দিলেন আমাদের, তাঁর পোশাক দিয়ে। নীল রঙের একটি ব্যাঙ্গালোর শাড়ি পরনে, তার সঙ্গে

সাদা ব্লাউজ—চুল বয়কাট করা, অলঙ্কার নেই—চোখে চশমা। কোনো আড়ষ্টতা নেই চলায়—যেন শাড়ি পরতে সদাই অভ্যস্ত! সঙ্গে এসেছেন দুই ননদ—ডাঃ বৎসলা কোটনীস এবং শ্রীমতী লীলাবতী কার্লেকর। কোটনীস মেমোরিয়াল কমিটি আয়োজিত ছবির প্রদর্শনী উদ্‌ঘাটন উপলক্ষে শ্রীমতী কুয়ো এসেছেন ভারতবর্ষে। বম্বে থেকে তাই কোটনীস ভগিনী দুজন ছুটে এসেছেন এই অল্প সময়টুকুতে ভ্রাতৃবধূর সঙ্গলাভের জন্য। এঁদের মুখে অনেক ছোটখাট পারিবারিক কথা শোনা গেল, সত্যি যা মনকে স্পর্শ করে।

যুদ্ধের পটভূমিকায় শ্রীমতী কুয়ো এবং দ্বারকানাথের রোমান্স কুঁড়ি থেকে ফুলে বিকশিত হতে সময় নিয়েছিল, কারণ সে যুগে এরকম unconventional আন্তর্জাতিক বিবাহ খুব বিরল ছিল। ১৯৪১ সালে অবশেষে তাঁরা সাতপাঁচ ভেবে তারপর বিয়ে করলেন এবং '৪২-এ তাঁদের ছেলে ইয়ন-হুয়ার (Yin-Hua) জন্ম হয়। International Peace Hospital-এর কাজে দিনরাত ডুবে থাকার জন্য ডাঃ কোটনীসের শরীর ভেঙ্গে পড়ে এবং '৪২-এর ডিসেম্বরে মাত্র ৩২ বছর বয়সে তিনি মারা যান। আশ্চর্য লাগে এই ভেবে যে তাঁদের ছেলে ইয়ন-হুয়ারও অকালমৃত্যু হয় প্রায় একই বয়সে। সেও তার বাবার মত ডাক্তারি পেশায় গিয়েছিল এবং সেই একইভাবে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছিল আর্তের চিকিৎসায়। শ্রীমতী বৎসলা, দ্বারকানাথের ছোট বোন তার ভাইয়ের পদানুসরণ করে আজ বোম্বাইতে ডাক্তারি প্র্যাকটিস করেন। তিনি চীনে গিয়ে acupuncture-ও শিখে এসেছেন। শ্রীমতী কুয়োর প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ। জানা গেল যে ডাঃ কোটনীসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ওঁর পরিবারের সকলে তাঁর বিয়ে এবং পুত্রের জন্মের কথা জানতে পারেন। তাতে দ্বারকানাথের বৃদ্ধ পিতা-মাতা বিচলিত হননি। বরং তাঁর মা পুত্রশোকের মধ্যেও এই ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন যে ছেলে অঘোরে একা একা বিদেশে মারা যায়নি—সে সময়ে প্রিয়জনেরা তাঁকে ঘিরে ছিল।

১৯৫৭ সালে দ্বারকানাথের বড় ভাই চীনে গিয়ে কুয়োর সঙ্গে দেখা করেন এবং পরের বছর ১৯৫৮ সালে কুয়ো তাঁর ছেলেকে সঙ্গে করে ভারত দর্শনে আসেন। সেই প্রথম তাঁর শ্বশুরবাড়ির দেশে পদার্পণ এবং ইয়ন-হুয়ারও তার পিতৃভূমির সঙ্গে পরিচয়। এক মাস তাঁরা ছিলেন দ্বারকানাথের পরিবারের সঙ্গে, এত মিলেমিশে যে একবারও মনে হয়নি এরা নবাগত। ষোল বছরের কিশোর ইয়ন-হুয়া ঘুরেফিরেই তার ঠাকুমার কাছটিতে গিয়ে বসত—ভাষাবিভ্রাটের ফলে আকারে ইঙ্গিতে মনোভাব প্রকাশ করত। বৃদ্ধা পিতামহীর জন্য কতটা খেয়াল ছিল সে বর্ণনা দিতে গিয়ে বৎসলা বললেন, একদিন একটু ঠাণ্ডা পড়াতে ইয়ন নিজে একটি শাল নিয়ে এসে পরম যত্নে ঠাকুমার গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিল। এত মিষ্টি স্বভাব—ভারতীয় খাবার, ভারতীয় আচার-ব্যবহার, সব শিখবার কী আগ্রহ মা-ছেলে দুজনেরই!

২৭ বছর পরে আজও দেখা যাচ্ছে মায়ের সেই আগ্রহ, সেই অনুসন্ধিৎসা বজায় আছে। যদিও শ্রীমতী কুয়ো পরবর্তী জীবনে আবার দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন—দুই সন্তান, নাতি-নাতনী-তে তাঁর ভরা সংসার। তবু দ্বারকানাথের দেশ তাঁকে হাতছানি দিয়েছে—তিনি সেই ডাকে সাড়া দিয়েছেন মনেপ্রাণে। দ্বারকানাথের আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে শ্রীমতী কুয়োর গলা ধরে এল। নিপীড়কের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা প্রয়োজন—এই কথাই দ্বারকানাথ বারে বারে বলতেন—এমনকি যুদ্ধের ফ্রন্টলাইনে আহত সৈনিক বা গ্রামবাসী চাষী নির্বিশেষে সকলকেই তিনি এই কথা প্রচার করতেন। তাদের বলতেন, উৎপীড়িতের সাহায্য করবার জন্য, তাদের জাগিয়ে তোলার জন্যই তিনি এতদূর দেশ থেকে ছুটে এসেছেন। তিনিও একজন মুক্তিযোদ্ধা। তাই চীন আজও তাঁর অবদান ভুলতে পারেনি। চৌত্রিশ বছর আগে Dr. Kotnis Memorial Hall প্রতিষ্ঠা করে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। আর ভারতবর্ষে সেইসময়ে 'ডাঃ কোটনীস কি অমর কহানী' ফিল্মে দ্বারকানাথের জীবনের অতুলনীয় ইতিহাস রেকর্ড করা হয়েছিল। যারা সেই ফিল্ম দেখেছেন তাঁরা কুয়োর ভূমিকায় জয়শ্রীর অভিনয় ভুলতে পারেননি। মাও সে তুং-এর উপদেশ দ্বারকানাথ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন—চীনা ভাষা রপ্ত করে স্বাধীনতার সংগ্রামের বাণী ছড়িয়ে ছিলেন গ্রামে-গ্রামে। মেয়েদের মধ্যে আত্মনির্ভরতার বীজ বপন করেছিলেন। আজ শ্রীমতী কুয়ো এই ছবির প্রদর্শনীর মাধ্যমে দ্বারকানাথের আন্তর্জাতিকতা (Internationalism) তুলে ধরতে চান—তাঁর নারী প্রগতিতে অটুট বিশ্বাস আমায় প্রবুদ্ধ করুক—ভারত আর চীনের দু হাজার বছরের মৈত্রী আবার ফুটে উঠুক দুই দেশের মেয়েদের মধ্যে, এই নতুন করে জানার পটভূমিকায়।

গায়ত্রী রায়

খাদ্য ও ক্যালরি

ডাঃ কল্যাণ মুখার্জি

কাউকে একটু মোটা দেখলেই রবিকাকু বলে যে, সে বেশি ক্যালরি খাচ্ছে। আচ্ছা ক্যালরি জিনিসটা কী একটু বুঝিয়ে বলতে পারো? টুকু অনুরোধ করে।

খাওয়া দাওয়া এবং পুষ্টির বিচারে যে-ক্যালরি আমরা ব্যবহার করি তাকে বড় ক্যালরি বলা হয়। হাজার গ্রাম (১০০০ গ্রাম) জলের উষ্ণতা ১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়াতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাকেই আমরা বড় ক্যালরি বলি। খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টির বিচার করা হয় এই ক্যালরির মাপকাঠিতেই। ছোট ক্যালরি থেকে বড় ক্যালরি সহস্রগুণ বেশি।

তবে সাধারণত আমরা বড় ক্যালরি কথাটা লিখি না, শুধু বলি ক্যালরি। আসলে পুষ্টির অভিধানে ক্যালরি মানেই বড় ক্যালরি। তাই যখন আমরা বলি ১ গ্রাম আমিষে ৪ ক্যালরি আছে তখন আমরা বড় ক্যালরির কথাই উল্লেখ করি। পুষ্টিবিদরা বড় ক্যালরি ব্যবহার করেছেন যাতে অহেতুক অনেক বড় বড় অংক করতে না হয়। যদি ছোট ক্যালরিকে ব্যবহার করা হত তাহলে ১ গ্রাম আমিষে ৪০০০ ছোট ক্যালরি আছে লিখতে হত। এতে লেখার কাজও বাড়ত এবং শূন্যের সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে হত। বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের গুণ পুষ্টিবিদরা বড় ক্যালরিতে কষেছেন এবং তার একটি তালিকাও আছে।

এই তালিকা দেখলে বোঝা যাবে যে ফেন-না-ফেলা ভাত আর ফেন-ফেলা ভাতের মধ্যে ক্যালরির তফাত খুবই কম। কিন্তু আয়তনে ফেন-না-ফেলা ভাত, রান্নার পর ফেন-ফেলা ভাতের প্রায় দ্বিগুণ হয়। তাই ফেন না ফেললে অনেক বেশি লোকের ক্ষুধা নিবৃত্তি করা যায়, অনেক কম ওজনের চাল রান্না করেও। তাছাড়া ফেন না ফেললে চালের কিছু ভিটামিনও সাশ্রয় করা যায়।

এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, ৩০০ গ্রাম বেগুনভাজাতে প্রায় ৪৯০ ক্যালরি থাকে। তাই যাঁরা তেলেভাজা বেশি খান তাঁদের একটু সমঝে চলা উচিত। আমি অনেককে জানি যাঁরা বিকেলবেলা সহজেই ৫০০ গ্রাম থেকে ৬০০ গ্রাম তেলেভাজা অক্লেশে খেয়ে ফেলেন। এবং তাঁরাই আবার মেদবৃদ্ধি হলে অনুযোগ করেন যে, কিছু না খেয়েই তাঁদের ওজন বাড়ছে। একটু চিন্তা করলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন যে, ৬০০ গ্রাম তেলেভাজাতে প্রায় ৯৮০ ক্যালরি থাকে। প্রতিদিন এই ৯৮০ ক্যালরি থেকে যদি ১০০ ক্যালরিও উদ্বৃত্ত হয় তবে মাসে ১০০ × ৩০ = ৩০০০ ক্যালরি বেশি হবে এবং বছরে হবে ৩০০০ × ১২ = ৩৬,০০০ ক্যালরি। এই ৩৬,০০০ ক্যালরি দেহ জমিয়ে রাখবে ৬ কেজি মেদ হিসেবে। তা হলেই দেখা যাচ্ছে যে মেদবৃদ্ধিটা একটা ক্রমবর্ধমান রোগ।

ধীরে ধীরে এটা দেহের সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। যদি আগেভাগেই এই রোগকে ঠিকমত রোখা না যায় তাহলে পরবর্তীকালে এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া কষ্টকর। দিনে ৫০ ক্যালরি অর্থাৎ ১টি বিস্কুট অথবা ১০টি চিনেবাদাম, অথবা ২ চামচ চিনি অথবা ১টি আপেল বেশি খেলে প্রতি বছরে ওজন বাড়বে ৩.৫০ কেজি অথবা ৭ পাউন্ড।

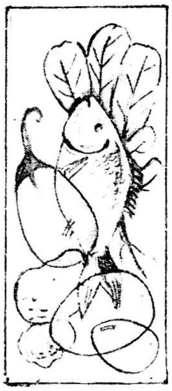
১০টি চিনেবাদাম অথবা ১টি বিস্কুট খাওয়ার আগে কেউ চিন্তাও করেন না যে, ওই খাদ্যে ৫০ ক্যালরি পুষ্টি আছে।

আজকাল পুষ্টিবিদরা একটি নতুন মাপকাঠি স্থির করেছেন, তার নাম দেওয়া হয়েছে জুল (Joules)। আজকাল পাশ্চাত্যদেশে জুলের ব্যবহারই বেশি। কারণ জুলের ব্যবহার আন্তর্জাতিক পুষ্টিবিদদের দ্বারা ১৯৭০ সাল থেকে অনুমোদিত হয়েছে। ১ ক্যালরিতে ৪.২ জুল থাকে। অর্থাৎ যদি কোনো খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টি হয় ১০০ ক্যালরি, তবে তাতে ৪২০ জুল পুষ্টি থাকবে। তবে এখনও পর্যন্ত জুলের হিসেব আমাদের দেশে বিশেষ চালু হয়নি, তাই ক্যালরির হিসেব জানলেই মোটামুটিভাবে নিজেদের দেহের পুষ্টিটুকু ঠিকভাবে চালিয়ে নেওয়া যাবে।

কার কত ক্যালরি দরকার ঠিকমত মাপতে না পারলে, বেশি খাওয়া হয়ে যেতেই পারে – মিঠু তার বাড়তি ওজনের কারণ দেখাবার চেষ্টা করে।

আসলে আমাদের দেহটাকে মোটরগাড়ির সংগে কিছুটা তুলনা করা যেতে পারে। কোনো লোক যদি কাজ না করে শুধু শুয়েই থাকে, তবুও তার হৃৎস্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত চলাচল, অন্ত্রের সঞ্চালন, তাপরক্ষা ইত্যাদি চালু থাকে। এই ন্যূনতম জৈবক্রিয়া বা বেজাল মেটাবলিজম-কে চালিয়ে যেতে একটি নির্দিষ্ট ক্যালরি প্রতি ঘণ্টায় খরচ হয়। এই ক্যালরিটুকু পুষ্টিবিদরা মেপে দেখেছেন যে –

(১) একজন বয়স্ক সুস্থ সবল



সক্রিয় অবস্থায় এবং শ্রমে (ন্যূনতম বিপাকক্রিয়া উদ্ভূত ক্যালরি ছাড়াও) বাড়তি ক্যালরির প্রয়োজন হয়।

সক্রিয় অবস্থায়

বসা অবস্থায়	ঘণ্টায়	১৫ ক্যালরি
দাঁড়ানো অবস্থায়	"	২০ "
কাপড় ছাড়া ও পরা	"	৩৩ "
ঘর মোছা, ঝাঁট দেওয়া	"	১০০ "
ধীরে হাঁটা (আড়াই মাইল)	"	১৪০ "
জোরে হাঁটা (পৌনে চার মাইল)	"	২৪০ "
সিঁড়ি বেয়ে ওঠা	"	১০০০ "
সিঁড়ি বেয়ে নামা	"	৩৬৪ "
সাঁতার কাটা	"	৫০০ "
সাইকেল চালানো	"	১৪০ "
নাচা	"	২৪০ "

শ্রমে

লেখা	ঘণ্টায়	২০ ক্যালরি
টাইপ করা	"	৩০ "
সেলাই করা	"	৭০ "
মুচির কাজ	"	১০০ "
হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং	"	১৩০ "
ইলেকট্রিকের কাজ	"	১৩০ "
ছুতোরের কাজ	"	১৪৯ "
রাজমিস্ত্রির কাজ	"	৩০০ "
কামারের কাজ	"	৩৫০ "
কাঠুরের কাজ	"	৩৮০ "
খনি মজুরের কাজ	"	৩২০ "

সাপটা মাপ বনাম প্রকৃত ওজন

ক

১ চা চামচ	=	৫ সিসি বা মিলিলিটার	=	৫ গ্রাম
১ টেবিল চামচ	=	১৫ " "	=	১৫ " (আধ আউন্স)
১ হাতা (বড়)	=	৫০ " "	=	৫০ "
১ কাপ (মাঝারি)	=	১৫০ " "	=	১৫০ "
১ আউন্স	=	৩০ " "	=	২৮.৩৫ "
১ পাউন্ড			=	৪৫৩.৬ "
১ গ্রাম	=	১ "		

খ

২ টেবিল চামচ মাখন	= ১ আউন্স
২ কাপ মাখন	= ১ পাউন্ড
২ কাপ দানা-চিনি	= ১ পাউন্ড
৪ কাপ আটা বা ময়দা	= ১ পাউন্ড
১ পাঁইট দুধ বা জল	= ১ পাউন্ড
২ কাপ রান্না করা ভাত	= ১ পাউন্ড
৪ টেবিল চামচ চিনি/আটা	= ১ আউন্স

রান্নার আগে এবং পরে কয়েকটি খাদ্যবস্তুর প্রকৃত ও সাপটা ওজন এবং পুষ্টিমূল্য

খাদ্যের নাম	রান্নার আগে ওজন		রান্নার পর ওজন		পুষ্টিমূল্য			
			প্রকৃত	সাপটা	প্রো :	ফ্যা:	শ:	ক্যালরি
১ ফেন-ফেলা ভাত		৫০ গ্রাম	১৬৫ গ্রাম	১ কাপ ৪ টেঃ চামচ	৩.২	০.২	৩৯.৫	১৭৩
২ ফেন-না-ফেলা ভাত		৫০ "	৩০০ "	২ কাপ	৪.২	০.৩	৩.৯০	১৭৫
৩ খিচুড়ি	চাল ডাল ঘি	৭৫ " ৭৫ " ১৫ "	৭৫০ "	৫ কাপ	২৫.২	১৬.৬	১০৯.৭	৬৯১
৪ চাপাটি বা রুটি	আটা	১০০ "	১৩০ "	৪ খানা ১ খানা	১২.১	১.৭	৭২.২	৩৫৩
৫ লুচি	ময়দা ঘি	১০০ " ২৫ "	১৩৩ "	৮ খানা ১ খানা	১.৪	৩.৫	৯.৩	৭২
৬ পাঁউরুটি (মেশিনে কাটা)		১৫ "		১ পিস	১.২	০.১	৮.১	৩৯
৭ বিস্কুট (ক্রিমক্র্যাকার)		১০ "		১ খানা	১.২	০.৩	৭.৫	৩৮
৮ বিস্কুট (থিন অ্যারারুট)		৬ "		১ খানা	০.৭	০.২	৪.৫	২৩
৯ মুসুর ডাল (ঘন)	ডাল তেল	১০০ " ৫ "	৩০০ "	দেড় কাপ ৬ টেঃ চামচ	২৫.১	৫.৪	৫৯.৭	৩৮৮
১০ মুসুর ডাল (পাতলা)	ডাল তেল	৫০ " ৫ "	২৫০ "	২ কাপ	১২.৫	২.৭	৩০.০	১৯৪
১১ মুগ ডাল (ঘন)	ডাল তেল	১০০ " ৫ "	৩১০ "	দেড় কাপ	২৪.০	৬.০	৫৬.৬	৩৭৬
১২ মুগ ডাল (পাতলা)	ডাল তেল	৫০ " ২.৫ "	৩২০ "	২ কাপ	১২.০	৩.৬	২৮.৩	–
১৩ ছোলার ডাল (পাতলা)	ডাল তেল	৫০ " ২.৫ "	২১৫ "	সোয়া এক কাপ	১১.২	৭.৫	২৯.৪	৩৯৩
১৪ আলু সিদ্ধ	আলু তেল	৫০ " ২.৫ "	৫০ "		০.৮	২.৫	১১.৪	৬৭
১৫ আলুভাজা (কড়া)	আলু তেল	৫০ " ২ "	২০ "		০.৮	৫.০	১১.৪	৯০
১৬ আলুভাজা (নরম)	আলু তেল	৫০ " ৮ "	২৯ "		০.৮	৮.০	১১.৪	১১৭
১৭ বেগুন পোড়া	বেগুন তেল	১২০ " ৩ "	৭০ "		০.৯	৩.২	৪.৩	৪০
১৮ বেগুন ভাজা	বেগুন তেল	২৭০ " ৪৫ "	১৫০ "		৩.২	৪৫.৭	১৬.০	৪৯০
১৯ নটেশাক ভাজা	শাক তেল	১০০ " ৫ "	৭০ "		৪ ৯	৫.৫	৫.৭	৯২
২০ পালংশাক সিদ্ধ	শাক তেল	১০০ " ২ "	৮২ "		১.৯	০.৯	৪.০	৩২
২১ মাছভাজা (রুই)	মাছ তেল	১০০ " ১৫ "	৪৮ "	৪ পিস	১৬.৯	১৬.৪	–	২১৯
২২ মাছভাজা (ইলিশ)	মাছ তেল	১০০ " ১০ "	৬০ "	৪ পিস	২১.৮	২৯.৩	–	৩৫০
২৩ দুধ (গরুর)	দুধ চিনি	১৭৫ " ৫ "	১৮০ "	১ কাপ	৫.৭	৬.৩	১১.০	১৩২
২৪ ডিম সিদ্ধ (হাঁসের)		৭৩ "	৬৫ "	১টি	৮.৮	৮.৯	০.৪	১১৭
২৫ ডিম সিদ্ধ (মুরগির)		৫০ "	৬৫ "	১টি	৫.৯	৫.৯	–	৭৮
২৬ চা	চা পাতা দুধ চিনি	৩ " ১০ " ৩ "	১৬৫ "	১ কাপ	১.১	–	১১.০	৪৯
২৭ বার্লির শরবত	বার্লি চিনি	৫ " ১০ "	১৭৫ "	১ কাপ	০.৪	–	১৩.০	৫৫

কয়েকটি খাদ্যবস্তু থেকে যে ক্যালরি পাওয়া যায়

(প্রতি ১০০ গ্রামে)

খাদ্যবস্তুর নাম	ক্যালরি
চাল (ঢেঁকি ছাঁটা)	৩৪৯
চাল (কলে ছাঁটা)	৩৪৫
গমের আটা	৩৪১
ডাল	৩১৬-৩৮৫
ছোলা	৩৮৫
চিনেবাদাম	৫৬১
পাঁউরুটি	২৩৭-২৬৪
দুধ (গরুর)	৬৭
দুধ (মাখন তোলা)	২৯
দই	৬০
ছানা	২৬৫
মাখন	৭২৯
ঘি	৮২৮
উদ্ভিদের তেল	৫৫৮-৯০০
নারকেল	৬৬২
চিনি	৩৯৪
গুড়	৩৮৩
মাছ	৭০-২৭৩
মাংস	১০৯-১৯৪
ডিম	১৭৩-১৮১
আলু	৮৩
কড়াইশুঁটি	১১২
কচু	১০০
কাঁঠালবিচি	১৮৪
রাঙালু	১২৫
ফুলকপি	১১-৪৩



পুরুষের লাগে ঘণ্টায় – ৭০ ক্যালরি, দিনে – ১৬৮০ ক্যালরি।

(২) একজন নারীর লাগে ঘণ্টায় ৬০ ক্যালরি, দিনে – ১৪৪০ ক্যালরি।

কাজ করার সময় একটি বয়স্ক পুরুষের ন্যূনতম বিপাক ক্রিয়ার জন্য যা ক্যালরি লাগে তাছাড়াও বাড়তি ক্যালরি দিতে হয়। উপরের তালিকাটা দেখলেই বোঝা যাবে যে, কীরকম কাজের জন্য কী ধরনের ক্যালরির প্রয়োজন।

এই তালিকা থেকে মোটামুটিভাবে মিঠুর কতটা ক্যালরি দিনে প্রয়োজন তা সহজেই মাপা যেতে পারে।

নাম – মিঠু, বয়স – ১৬ বছর, কলেজের ছাত্রী

(১) ২৪ ঘণ্টার ন্যূনতম বিপাক ক্রিয়া (২৪ × ৬০) = ১৪৪০ ক্যালরি

(২) ১ ঘণ্টা মুখ ধোয়া স্নান করা ইত্যাদি (১ × ৩৩) = ৩৩ ক্যালরি

(৩) ৬ ঘণ্টা লেখাপড়া করা (৬ × ৫০) = ৩০০ ক্যালরি

(৪) ৪ ঘণ্টা সাংসারিক কাজ (৪ × ৩৩) = ১৩২ ক্যালরি

(৫) ৫ ঘণ্টা যাতায়াত, সিঁড়িভাঙা হালকা শ্রম (৫ × ৮০) = ৪০০ ক্যালরি

দৈনিক মোট ক্যালরি = ২৩০৫

এবার দেখতে হবে প্রতিদিন মিঠু কতটা ক্যালরি খাচ্ছে, তাহলেই বোঝা যাবে মিঠুর ওজন কোন দিকে যাবে। অর্থাৎ একটু চেষ্টা করলেই ওজনটাকে বাগে রাখা যায়। তবে একবার যদি ওজন-স্বরূপ দৈত্যটি অবাধ্য হয়ে ওঠে তবে তাকে বাগ মানানো মুশকিল কারণ তখন মনটাও সাড়া দিতে চায় না।

পুষ্টিবিদরা সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, দেহ যদি একবার অধিক ক্যালরিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তবে তাকে কম ক্যালরি দিলে মানসিক অস্বস্তি হতে পারে।



ফেমবার্ড প্রন ফ্রাই

রকমারি চারটি খাবার

ফেমবার্ড প্রন ফ্রাই

২৫০ গ্রাম মাঝারি সাইজের চিংড়ি, ১৫০ গ্রাম মাখন, ৮টি কাঁচালঙ্কা, ২ কোয়া রসুন, একটুকরো আদা, ১ টেবল-চামচ সয়া সস, ২ টেবল-চামচ টক দই, ১টি বড় পেঁয়াজ-কুচোনো, ১টি বড় আলু আঙুলের আকারে লম্বালম্বিভাবে কাটা, ২ টেবিল-চামচ ধনেপাতা কুচোনো, ২ টেবল-চামচ কুরোনো নারকেল, আন্দাজমত নুন।

চিংড়িমাছ খোসা ছাড়িয়ে ধুয়ে রাখুন। একসঙ্গে লঙ্কা, রসুন, আদা বাটুন এবং এই বাটার সঙ্গে সয়া সস, দই ও নুন মেশান। চিংড়িমাছ এই মিশ্রণের মধ্যে দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন এবং প্রায় আধ ঘন্টা মত এইভাবে রেখে দিন। ফ্রাই প্যানে মাখন গলতে দিন। গরম হলে আলুর ফিঙগারগুলি ভেজে তুলে রাখুন (আলু আগে সিদ্ধ করে তারপর কেটে নিয়ে ভাজবেন)। এবার পেঁয়াজ বাদামী করে এই মাখনে ভেজে নিন। তারপর চিংড়ির মিশ্রণটি মাখনে দিয়ে দিন ও হালকা বাদামী করে ভেজে একটি প্লেটে সাজিয়ে দিন। মাছের ওপরে ভাজা পেঁয়াজ, নারকেল কোরা, ধনেপাতা ছড়িয়ে দিন ও চারধারে আলুর টুকরো সাজিয়ে দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

এগ ফুইয়ং

৬টি ডিম, ৩ চা-চামচ ময়দা, আধ কাপ দুধ, ২টি পেঁয়াজ মিহি করে কুচোনো, ৪টি কাঁচালঙ্কা কুচোনো, ১ কাপ সিদ্ধকরা নুডলস্ (আজকাল ম্যাগি নামে যে নুডলসৃটি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে আপনি ইচ্ছে করলে, সেটিও সিদ্ধ করে দিতে পারেন), ভাজবার জন্য বাদাম তেল বা মাখন, আন্দাজমত নুন, ১ চা-চামচ রসুন বাটা।

প্রথমে ডিম, দুধ, ময়দা, লঙ্কা, পেঁয়াজ, নুডলস্, রসুন ও নুন একসঙ্গে খুব ভালভাবে মেশান। প্রায় পনেরো মিনিট ধরে ফেটান। এবার ফ্রাইপ্যানে তেল গরম করতে দিন এবং এই মিশ্রণ থেকে অল্প করে নিয়ে এক-একটি ওমলেট তৈরি করুন। এইভাবে প্রায় ৬/৭টি ওমলেট তৈরি করে টম্যাটো সসের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন। মুখরোচক জলখাবার হিসেবে এটি আপনি সহজেই তৈরি করতে পারবেন।

আলুর প্যাটিস

আধ কিলো সেদ্ধকরা আলু, ৪ টুকরো জলে ভেজানো পাউরুটি, ১ চা-চামচ রসুন বাটা, আধ চা-চামচ লাল লঙ্কার গুঁড়ো, আন্দাজমত নুন, ২ টেবল-চামচ কুচোনো ধনেপাতা, ভাজবার জন্য তেল।

পাউরুটি মিনিট পাঁচেক জলে ভিজিয়ে রেখে তুলে নিয়ে হাতের তালুতে চেপে জল বার করে নিন। এবার আলু ভাল করে চটকে নিয়ে এর সঙ্গে পাউরুটি এবং অন্যান্য উপকরণ মেশান। হাত দিয়ে চ্যাপটা করে গড়ে নিন, (চপের আকারেও গড়তে পারেন)। ফ্রাইপ্যানে ঘি গরম করতে দিন, গরম হলে প্যাটিসগুলো বাদামী করে দুপিঠ ভালভাবে ভেজে নিন।

চানা-বাটুরা

বাটুরার জন্য প্রয়োজন ২৫০ গ্রাম ময়দা, ১২০ গ্রাম টক দই, ১ টেবল-চামচ খাবার সোডা, গরম জল ৭/৮ টেবল-চামচ, চিনি ১ চা-চামচ, সামান্য নুন।

প্রথমে ময়দা, সোডা এবং নুন ভাল করে মিশিয়ে নিন। এবার ময়দায় চিনি, দই এবং গরম জল মেশান এবং ভালভাবে ঠেসতে থাকুন (দেখবেন খুব নরম যেন না হয়)। যখন দেখবেন আঙুল থেকে ময়দা ছেড়ে যাচ্ছে তখন বুঝবেন যে মাখা হয়েছে। এবার একটি ভিজে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে এই ময়দার তালটি ঢেকে ফেলুন। অন্তত চার ঘন্টা এইভাবে রেখে দিন। এরপর এই ময়দা থেকে পনেরোটা লেচি করুন। বলের আকারে গড়ুন। হাতের তালুর সাহায্যে এই বল চ্যাপটা করে বড় লুচির আকারে বেলে নিন। (লেচি এমন আকারে করবেন যাতে সাধারণ লুচির থেকে এই বাটুরা একটু বড় আকারের হয়)।

চাটুতে ঘি গরম করতে দিন। যখন ঘি থেকে ধোঁয়া উঠবে তখন এই বাটুরা এক-একটা ভেজে নিন হালকা বাদামী করে।

বাটুরা পরিবেশন করুন কাবুলি-চানার তরকারির সঙ্গে।

তরকারির জন্য প্রয়োজনঃ ১ কাপ কাবুলি ছোলা, খাবার সোডা একচিমটি, চা-পাতা ২ চা-চামচ, ঘি আধ কাপ, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ১ চা-চামচ ধনেগুঁড়ো, ১ চা-চামচ লঙ্কাগুঁড়ো, আধ চা-চামচ এলাচগুঁড়ো, ২টি কাঁচালঙ্কা চেরা, একটি মাঝারি আকারের পেঁয়াজ, একটি লেবু ফালি করা, ২ কাপ জল, দেড় চা-চামচ নুন।

প্রথমে ছোলা বেছে ধুয়ে সারারাত ভিজিয়ে রাখুন। এবার ছোলা প্রেসারে সেদ্ধ করতে দিন। জলে সোডা দিয়ে দেবেন এবং চা-পাতা একটি পাতলা কাপড়ে বেঁধে প্রেসারের ভেতর দিয়ে প্রায় আধ ঘন্টা সেদ্ধ করুন।

সিদ্ধ হয়ে গেলে প্রেসারের ঢাকা খুলে জল ও চা-পাতা ফেলে দিন এবং ছোলা তুলে নিয়ে এর সঙ্গে গুঁড়ো মশলা মেশান। ২/৩ মিনিট উনুনে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে ফেলুন।

এবার কড়ায় ঘি গরম করতে দিন। যখন ঘি থেকে ধোঁয়া বেরোবে তখন ছোলাগুলো ছেড়ে দিন। সামান্য নেড়েচেড়ে নামিয়ে ফেলুন। ছোলার উপর পেঁয়াজকুচি, কাঁচালঙ্কা ও লেবুর ফালি সাজিয়ে দিয়ে গরম বাটুরার সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সুস্মিতা সরকার

ফটো : অচিন্ত্য হাজরা

ঈদ– আনন্দ অনুদান ও মিলনের উৎসব

নীনা আতাহার



ত্রিশ অথবা উনত্রিশ দিনের সংযম পালন তথা রোজার পর প্রতিবারই ফিরে ফিরে আসে সেই আনন্দ উৎসব, সেই সাম্য ও প্রীতির দিন। মিলনের দিন-ঈদ। মুসলমানদের কাছে রমজান মাস বড় পবিত্র। এবং সারা বছরের (চান্দ্র মাসের হিসেবে) বারোটি মাসের মধ্যে এ মাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঈদের কথা বলতে গেলে প্রথমে তাই রোজার কথা জানতে হয়। ঈদ যত বড়ই পরব হোক না কেন আসলে এ হচ্ছে রমজানের ঈদ। রোজার উপবাস আছে বলেই, কৃচ্ছ্রসাধন আছে বলেই ঈদ হচ্ছে খুশির দিন। রোজা ছাড়া ঈদ মূল্যহীন।

চান্দ্র মাসের হিসেবে আরবী মাসগুলোর হিসেব। তাই চাঁদের জন্ম থেকেই মাসের সুরু। মোহাররাম (আরবী প্রথম মাস বাংলার বৈশাখের মতো) থেকে জেলহজ্জ (শেষ মাস) প্রতিটি মাসের শুরু চাঁদ দেখে তথা নতুন চাঁদের শুরু থেকে। প্রতিপদ বা শুক্লপক্ষের প্রথম দিন। নবম মাস হচ্ছে রমজান। চাঁদ দর্শন হলো, উপবাস শুরু। সারাটা দিন নিরম্বু উপবাস। না জল না ধোঁয়া কোনো কিছু খাওয়া। পান চলবে না এবং শুধু উপবাস নয় পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সংযম। রোজার দুটো শব্দ অনেকের পরিচিত। শেহরী। এফতার। শেষ রাতে উঠতে হয়। কিছু খাওয়া। এই শেষ রাতে (রাত তিনটে নাগাদ) সামান্য খাওয়াকে শেহরী বলে। অতঃপর চলল উপোস। সারাটা দিন। সূর্য ডুবলে পুনশ্চ। এই খাওয়াটা এফতার। রোজার সঙ্গে নমাজ যথানিয়মিত এইভাবে চলতে থাকে একমাস।

মানুষ দোষে গুণে পূর্ণ। নানান দুষ্টুমি, ফন্দি ফিকির তার মাথায়। নানাবিধ যুক্তিতে সে ধর্মের মধ্যে অধর্ম খুঁজে বের করে। কোথায় গোলমাল ছিদ্রান্বেষীদের চোখ এড়ায় না তাই ইসলামধর্মের কিছু অনুশাসন আছে, সময় বেঁধে দেওয়া আছে পালনের। সারা বছর যাই করো (ভাল করলে ভাল অবশ্যই) রমজান মাসে যাবতীয় অসংযমতা, অন্যায়, অনাচার একদম নয়। পবিত্রতার সঙ্গে পালিত হোক রমজান। উপবাসের মাধ্যমে দেহকে নির্মল রাখো এবং অনুভব করো ক্ষুধার জ্বালা কী। যে মানুষ উপবাসে, না খেয়ে দিন কাটায় তার কষ্ট কী। এইরকম কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে শেষ হয় ত্রিশ বা উনত্রিশ দিন। রমজান মাসও শেষ। দমাস মাস সওয়াল-এর শুরু। আর পয়লা সওয়াল হচ্ছে ঈদুল ফিতর।

আরো একটু বলে নেওয়া যাক তাহলে পরিষ্কার হবে। ঈদ দুটো। ঈদুল ফিতর। ঈদুল আয়হা বা ঈদুজ্জোহা বা বকরিদ। রমজানের ঈদটি ঈদুল ফিতর। দ্বিতীয় ঈদটি এই ঈদের দু মাস দশদিন পর। জেলহজ্জ মাসের দশ তারিখ। ঈদুজ্জোহা হযরত ইব্রাহিমের পুত্র বলিদানের ঘটনার স্মৃতি। এইজন্যে সেই ঈদের আর এক নাম কোরবানি।

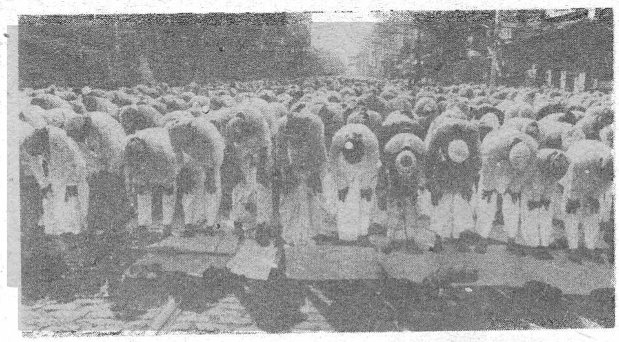
এখন এই ঈদের কথা বলা যাক। যদিও এটির মূল কথা আনন্দ এবং উৎসবটিও তাই। তাহলেও এর কিছু তাৎপর্য আছে। এই ঈদের সঙ্গে যুক্ত ফিত্‌রা মাঙ্গটি। ঈদুল ফিতর। খুব ভোরে উঠে স্নান সেরে পরিচ্ছন্ন পবিত্র পোশাক পরে (নতুন পোশাক বলে কোনো কথা নেই। নতুন হলে ভাল কিন্তু যাই হোক পরিষ্কার ও পবিত্র হওয়া দরকার। অনেকে নতুন পোশাককে ধুয়ে নিয়ে তা পরেন নমাজ পড়ার জন্যে। শুধুমাত্র তার পবিত্রতা বজায় রাখতে) নমাজের জন্যে তৈরি হন। কিন্তু তার আগে দানখয়রাত – ফিতরা। যার ক্ষমতা আছে অর্থাৎ উপার্জনের অর্থ খাওয়া পরার পর উদ্বৃত্ত হলে তার কিছু অংশ দান বাধ্যতামূলক। এই দানের নাম ফিতরা।

অনেকেই দরিদ্র। এই খুশির দিনে অনেকের বাড়িতেই হয়তো খাদ্যাভাব। তাই প্রতিবেশী, অনাথ, গরিব বিধবা প্রভৃতি মানুষের মুখে হাসি ফোটানো, তার ঘরেও খাদ্যের ব্যবস্থা করে তারপর ঈদ পালন। দরিদ্র প্রতিবেশী সেদিন কষ্টে কাটাবেন অথচ আনন্দ উৎসব চলবে, না সেটি চলবে না। সবাইকে নিয়ে ঈদ। তাই এই দান তথা ফিত্‌রা অবশ্যই। ঈদুল ফিতর তবেই সার্থক।

ঈদের নমাজ দু রেকাত (নমাজের ভঙ্গি যাঁরা দেখেছেন খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন। দাঁড়িয়ে নমাজ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক রেকাত। যতবার দাঁড়ালেন তত রেকাত – একটা সোজা হিসেব দিলাম।) এই নমাজ ওয়াজিব। যদিও ঈদের নমাজে প্রচুর সমাগম। যিনি কখনো নমাজ পড়েন না তিনিও ঈদের দিনে ভক্তিভরে নমাজ পালন করেন কিন্তু এই নমাজের মূল্য প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নমাজের চেয়ে অনেক কম।

নমাজ শেষে মিলন পর্ব। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ঈদ মিলনের উৎসব। সাম্য ও মৈত্রীর আর এক নাম ঈদ। এখানেও সেই পুরনো কথা। শত্রুতা, বিরোধ, ঝগড়া বিবাদ এও আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ। প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বন্ধ, কবে যেন সে কটু কথা বলেছিল। বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া সে যেন কোথায় বেড়াতে গেছিল আমাকে না বলে এইরকম ছোটখাটো থেকে মামলা, মারামারি প্রভৃতি বড় ব্যাপারে বিরোধ। ঈদের দিন সব ভুলে যাওয়ার দিন, ভালবাসার দিন, মিলনের দিন, আলিঙ্গনের দিন। বিজয়া দশমীর বিকেলবেলা। ঈদের সকালবেলা। তারপর তো চলল সারাটা দিন।

উৎসবের আনন্দ আমেজ আসলে এই পারস্পরিক মিলনকে কেন্দ্র করে। অবশ্য মিলনের সঙ্গে আছে মিষ্টিমুখ। ঈদের বিশেষ খাবার এ দেশে দুটি – সিমাই ও ফিরনি। আজকাল সিমাই আর নতুন করে চিনিয়ে দিতে হবে না, সবাই জেনে নিয়েছেন; ফিরনি তো পায়েসের অন্য নাম। লাচ্ছা সিমাইও ঈদের খাবার। খুব সহজেই তৈরি হয়ে যায়। লাচ্ছা এখন সব সিমাইয়ের দোকানেই থাকে। পরিমাণ মতো দুধে চিনি মিশিয়ে লাচ্ছাটা ডুবিয়ে দিলেই হলো। পাঁচ মিনিটেই উপাদেয় দারুণ খাবার। এ ছাড়া সকালবেলায় দুধ ও খুরমা মিশিয়েও অনেকে খান। একটু ঘন দুধে চিনি মিশিয়ে খুরমা কেটে কয়েক টুকরো করে ভিজিয়ে দিন। এটিও উপাদেয় উপকারী। মিষ্টিই ঈদের প্রধান খাবার। বিরিয়ানি মুর্গি খেতে চাইলে আপত্তি কী। খুশি তো খালি পেটে হয় না বিশেষ করে এই মিলনের মহোৎসবে। আর ঈদ মানেই তো খুশি।



নমাজ পড়ার দৃশ্য

ছবি : অচিন্ত্য রায়

বম্বে ফিলিম জগৎ এখন তরুণীদের দখলে

হঠাৎই বম্বের চলচ্চিত্র জগতে হাজির হয়েছে একঝাঁক উজ্জ্বল তরুণী। শুধু আসাই নয়, জয় করে নিয়েছে পুরো ফিল্ম দুনিয়া। স্বাভাবিক, প্রাণবন্ত অভিনয় ও নিষ্ঠায় তারা আজ খ্যাতির স্বর্ণ-শিখরে। এই তরুণী অভিনেত্রীদের নিয়ে একটি অন্তরঙ্গ আলোচনা।



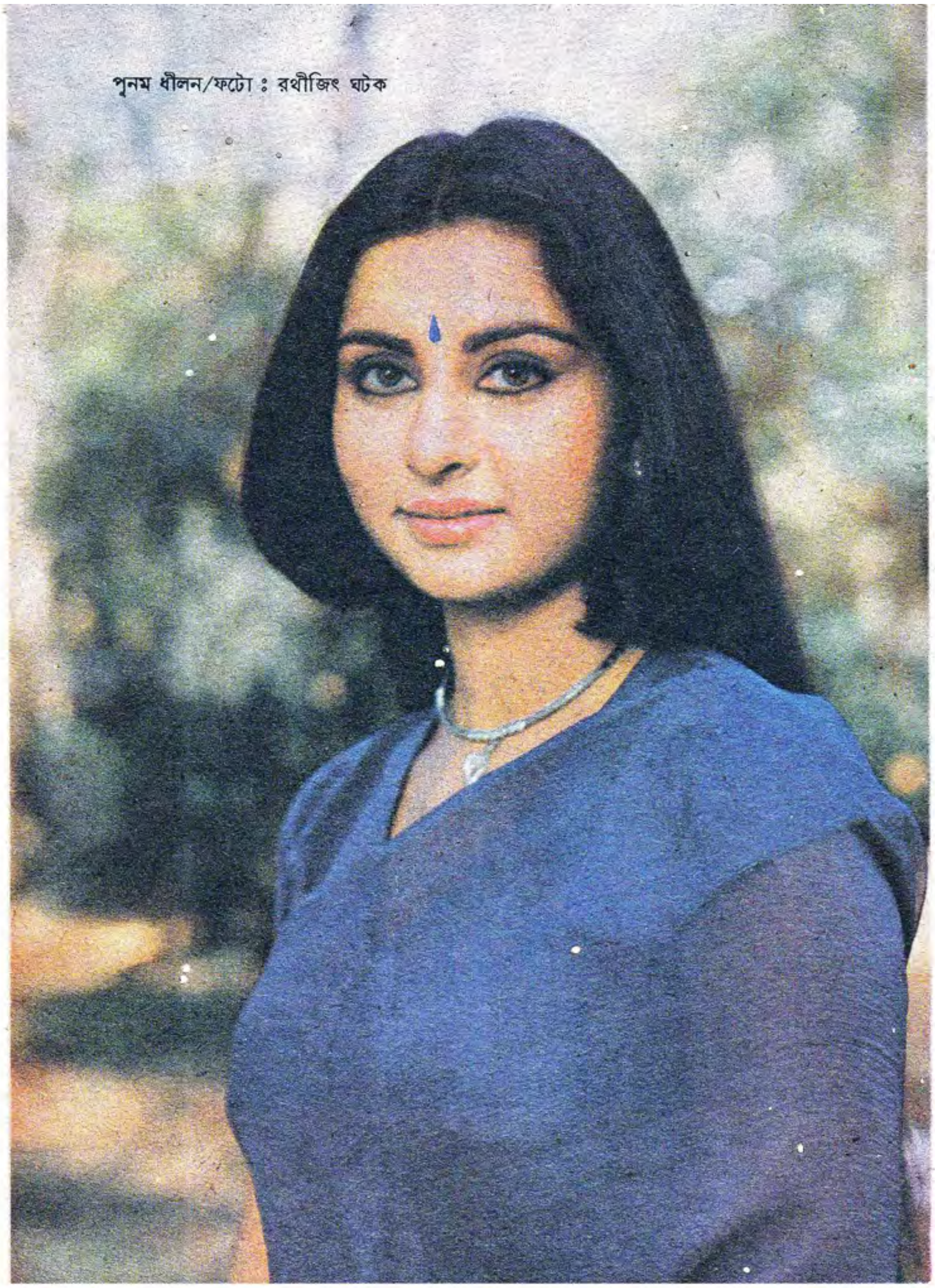
টিনা মুনিম

কিছুদিন যাবৎ বম্বেতে এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটছে যাতে পোড়-খাওয়া সমালোচকদের নড়েচড়ে বসতে হচ্ছে, আর সেই সঙ্গে সমাজতাত্ত্বিকদের মাথা একটু চুলকোতে হচ্ছে। বম্বে ছবিতে একসঙ্গে একঝাঁক শক্তিময়ী তরুণী অভিনেত্রী এসে হাজির হয়েছেন। বয়সের বিচারে এদের অধিকাংশ একেবারে খুকু, কিন্তু এঁদের দাপট অসীম। বম্বে ছবির চোখধাঁধানো পৃথিবী ধীরে ধীরে কিন্তু নির্ভুলভাবে এই তরুণীদের দখলে চলে যাচ্ছে।

এদের অনেকের অভিনেত্রী-জীবন শুরু হয়েছিল ফ্রক পরার বয়সে। স্মিতা পাতিল ছিলেন ছাত্রী, পুনম ধীলনও লেখাপড়া করতে করতেই এলেন চলচ্চিত্রে। সারিকা ছিলেন নিতান্ত কিশোরী। অমৃতা সিং তো তখনও কলেজেই ঢোকেননি। অনিতা রাজ বন্ধুদের সংগে আড্ডা দিয়ে আর শাড়ি ও চপ্পলের দোকানে ঘুরে বেড়াতেন। শ্রীদেবী প্রথম ছবি করেন যখন, তখন বালিকাই ছিলেন। আশা সচদেব বা শাবানা আজমির কথা ধরুন। দুজনেই অভিনয় শুরু করেন পুনার ফিল্ম ইনস্টিটিউটে ছাত্রী থাকাকালীন। অনুরাধা প্যাটেল ছবিতে আসেন পড়াশোনার ফাঁকে, বাড়ির বিশেষ করে মাতামহ বম্বের প্রবাদ-পুরুষ অশোককুমারের আপত্তি গ্রাহ্য না করে। বিজয়েতা যখন 'লাভ স্টোরি'তে অভিনয় করেন তখন কলেজে ঢোকেননি। 'দেশ ‍ রদেশ' করে এমন বিখ্যাত হয়ে পড়লে টিনা মুনিম যে আর লেখাপড়া হয়ে উঠল না। 'ববি' করার সময় ডিম্পল কাপাডিয়ার বয়স কতই বা ছিল? আর পদ্মিনী কোলহাপুরে বা খুশবু তো প্রথমে খুকুর ভূমিকা দিয়েই অভিনেত্রী জীবন শুরু করেছিলেন।

কিন্তু এই খুকুরা যে ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সেগুলির অধিকাংশ ছিল পাকা, ঝানু মেয়ের। 'প্রেম রোগে' পদ্মিনী হলেন এক

পুনম ধীলন/ফটো ঃ রথীজিৎ ঘটক



তরুণী বিধবা; বি আর চোপড়ার পরবর্তী ছবিতে রতি অগ্নিহোত্রী হবেন এক গণিকা। ভূমিকা যাই হোক, এই মেয়েগুলি বম্বে ছবিতে তরুণী নারীকে একেবারে নতুন চোখে দেখতে আমাদের বাধ্য করেছে।

ব্যাপারটা যে আমরা অনায়াসে গ্রহণ করতে পেরেছি, তাও নয়। বড় হওয়া, প্রেমে পড়া, কিংবা ধরুন সেই বয়সে পৌঁছানো যখন সব পৃথিবীটাই মাদকতাময় বলে ঠেকে – এই সব কথা তো স্পষ্টাস্পষ্টি আমাদের ছবিতে কখনো বলা যায়নি। অনেক বাঁধন আমরা মেনে চলেছি। বড়জোর দেখেছি যে নায়ক-নায়িকা একই বোতল থেকে কোল্ড ড্রিংক খেয়েছে দুটো স্ট্র দিয়ে। আর এখন? 'চক্র' ছবিতে স্মিতা পাতিলের ভূমিকার কথা ভাবুন। তাঁর রোলটা একটু যে গুঞ্জন তোলেনি তা নয়, তবে সাধারণভাবে দর্শক ওটা মেনেই নিয়েছে।

অথবা 'বেতাব' ছবিতে অমৃতা সিংয়ের কথা স্মরণ করুন। তাঁর ভূমিকা একটি স্পষ্ট, সরল নারী-চরিত্রকে উপস্থিত করল, যার ফল হল আজ তরুণ-তরুণীর জীবন-যৌবন নিয়ে সত্য কথাগুলো সহজে বলা যাচ্ছে – ভয়ে ভয়ে কতকগুলো কৃত্রিম সাজানো বুলির আশ্রয় নিতে হচ্ছে না।

'এক দুজে কে লিয়ে', 'বেতাব', 'লাভ স্টোরি' তিনটি ছবিতেই দেখা যাচ্ছে নায়ক বা নায়িকা বড়দের জগৎ থেকে দূরে সরে গিয়েছে অথবা প্রথাগত সমাজ থেকে পলায়ন করেছে। যে অভিনেত্রীরা এই ছবিগুলির নায়িকা, তাঁরা যেমন একদিকে ক্ষমতার পরিচয়

শাবানা আজমি /ফটো ঃ দীপক মেহতা





স্মিতা পাতিল/ফটো

দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনই ছবির পরিচালকরা তাঁদের দিয়েছেন স্বাভাবিক, সেন্টিমেন্ট-বর্জিত সিচুয়েশন। 'বেতাব'-এ চুম্বনের দৃশ্যটি অসাধারণ তীব্র হয়ে উঠেছিল; মনে হচ্ছে নায়ক-নায়িকার যৌনচেতনা এখন বম্বে ছবিতে এমনি তীব্রভাবে চিত্রিত হতে থাকবে।

আশ্বাসের কথা, এই নিয়ে কোনো ঢাক পেটানো হ[illegible] না। বম্বের ছবিতে শিশুদের কোনদিন [illegible] বলে বোঝা যায়নি। মেয়েরা তো ছিল [illegible], ধরাছোঁয়ার বাইরে। ভারতীয় ছবিতে স্পেন-ইতালির মতো মেয়েরা [illegible]য় দেবী, নয় দেহপসারিনী। যদি বা একটি কম বয়সের মেয়ের প্রয়োজন হয়েছে একটু ইঙ্গিতধর্মী কোনো চরিত্রে, তো বম্বের পরিচালকরা বেশি বয়সের ছিমছাম চেহারার নায়িকাদের নির্বাচন করেছেন। যেমন, ওয়াহিদা রহমান, মীনাকুমারী, মধুবালা। শ্যাম বেনেগল বলেন, অভিনেত্রী নির্বাচন করার সময় তিনি দেখেন তার চোখ দুটি দীর্ঘ কিনা, তাতে বুদ্ধির ছাপ আছে কিনা। বোধহয় এইজন্য শ্যামের ছবিতে শাবানা বা স্মিতার মতো নায়িকাদের দেখতে পাওয়া যায়। অন্যদিকে রাজ কাপুর চান 'প্রাণ, টগবগে প্রাণ', তাই তাঁর নায়িকা হন পদ্মিনী (প্রেম রোগ) অথবা মন্দাকিনীর (রাম তেরি গঙ্গা মৈলী) মতো মেয়েরা।

'নিকা' ছবির পরিচালক বি আর চোপড়া আমাকে বলেছিলেন, 'আমার শিল্পীদের কখনো বলে দিই না কী করতে হবে। তার চেয়ে ওই দৃশ্যের ব্যাপারটা কী বুঝিয়ে দিই



রতি অগ্নিহোত্রী/ফটো : রথীজিৎ ঘটক



...ল/ফটো : দীপক মেহতা



মুনমুন সেন/ফটো : সমীর সিংহ রায়



শ্রীদেবী



মীনাক্ষী শেষাদ্রি / ফটো : অনিল পরেদি

এবং ওদের বলি নিজের ভাষায় তোমার অনুভূতি প্রকাশ করো।' শিল্পীর এই স্বাধীনতা থেকেই নতুন প্রজন্মের নায়িকারা জোর পেয়েছেন। হৃষীকেশ মুখার্জি বলেন, 'কিশোরী অভিনেত্রীরা একটু-আধটু চাপা হাসে বটে কিন্তু তারা বাধানিষেধের তোয়াক্কা করে না। প্রথম দিকটা নয়। তৃতীয়-চতুর্থ ছবি করতে এসে তখন ভয় পেতে শুরু করে।'

রতি অগ্নিহোত্রীকে বলেছিলাম হৃষীকেশ মুখার্জির কথা। রতি বললেন, 'আমি কখনো নার্ভাস হই বলে আমার মনে হয় না। আমি দিলীপ কুমারের সঙ্গে এবং অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে অভিনয় করেছি।' সুভাষ ঘাই ওই প্রসঙ্গে একটা ভাববার মতো কথা বললেন, 'কমবয়েসী মেয়েরা অভিনয়টা করে স্বাভাবিক, যদি আপনার উদ্দেশ্য হয় একটা দৃশ্যের মাধ্যমে দর্শককে যাহোক কিছু একটা বোঝাবেন। আর ওই কাজটাই হলো সত্যিকার অভিনয়।' ১৯৮৪ সালের বৃহত্তম হিট 'হীরো' ঘাইয়ের কথার প্রমাণ। 'হীরো' ছবির প্রধান ভূমিকায় ছিল দুটি নবাগত তরুণ-তরুণী। ঘাই বলছিলেন, 'প্রাথমিক অসুবিধে ছিল এই যে, জ্যাকি শ্রফ-আর মীনাক্ষী পরস্পরের প্রতি ভয়ানক আড়ষ্ট ছিল। এটা দূর করার জন্য বললাম তোমরা একে অন্যের হাত ধরে থাকো দশ মিনিট করে – আর পরস্পরের চোখ থেকে দৃষ্টি সরাবে না। তারপর দেখি একটু চাপা হাসি, তারপর ঝগড়া, তারপর হোহো করে হাসি। শেষকালে দুজনের ব্যবহার ঠিক শিশুর মতো হয়ে-এসেছিল।'



আশা সচদেব

পদ্মিনী একদিন বলছিলেন 'প্রেম রোগ'-এ অভিনয়ের অভিজ্ঞতা : 'আমার মা আমার সঙ্গে স্টুডিওতে আসতেন। রাজজী যা বলতেন মাকে ডেকে বলতেন আর মা বলতেন আমাকে। প্রথমদিকে আমার সঙ্গে কী কথা বলবে কেউ যেন বুঝে পেত না। তারপর আর ছেলেমানুষ হিসেবে নয়, বড় হয়ে যাওয়া অভিনেত্রী হিসেবে সকলের সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। দেখলাম, আর কোনো অসুবিধে নেই।'

অসুবিধে যাই থাক, বম্বের খুকুরা এখন জমিয়ে বসেছেন। তাঁরা রোল নিচ্ছেন বাছ-বিচার করে। স্বচ্ছ পোশাক পরতে হবে বলে



ডিম্পল কাপাডিয়া



খুশবু

কয়েকটা অফার অনুরাধা প্যাটেল গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে এখনই ওরকম উদ্দাম কিছু করার সময় আসেনি। পুনম ধীলন লেখাপড়া ছেড়ে ছবিতে এসেছিলেন। তিনি বলেন, 'আসলে দু একটি ছেলের সংগে যে মেলামেশা করতাম সেইটাই ত্যাগ করতে হয়েছে। প্রাক্তন বয়-ফ্রেন্ডরা বোধহয় ভাবছে এখন আর ডেটিং করা প্রভৃতি সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাই না। কিন্তু মাথা যে ঘামাই !'

অনুরাধা প্যাটেল তাঁর স্বকীয়তার জোরে প্রতিষ্ঠিত হতে চান। মাতামহ অশোক-কুমারের পরিচয়ে পরিচিত হতে তাঁর খুব আপত্তি। তিনি বলেন, 'লোকে বলে আমাকে নাকি দাদুর মতো দেখতে। একেবারেই নয়। উনি যে আমার দাদু আমার মনেই থাকে না।' আরতি গুপ্ত 'পুরানা মন্দির' ছবিতে আবির্ভূত হয়েই দর্শকের নজর কেড়েছেন। উনি বলেন, 'দুর্ঘটনাক্রমে ফিল্মে এসে পড়েছিলাম। তবে সফল যে হয়েছি সেটা দুর্ঘটনা নয়।' আবার যাঁরা বলেন শাবানা আজমি নিতান্ত অনায়াস-অভিনয় করেন, শবানা তাঁদের কথা মানেন না। তিনি বলেন, 'লোকে বলে আমার অভিনয় অভিনয় বলে মনেই হয় না। কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। আমার অভিনয়ের পিছনে অনেক আয়াস, অনেক সাধনা আছে। 'মান্ডি' ছবির জন্য গণিকালয়ে দিনকতক থেকে গণিকাদের হাবভাব স্টাডি করেছিলাম।'

টিনা মুনিম এখন তো বেশ প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু নিজের জীবন সম্পর্কে তিনি খোলাখুলি বলেন, 'খ্যাতি সৌন্দর্য এসব আমাকে ভাবায় না। আমি ভালবাসি জীবন। কত স্টারের সংগে রোজ দেখা হয়। অভিনেত্রী না হলে এসব কি পেতাম ?' এককালের মিস ইন্ডিয়া এবং কৃতী নর্তকী, বর্তমানে বম্বের উদীয়মান স্টার মীনাক্ষী শেষাদ্রির মতে চলচ্চিত্রের কাজ পরিশ্রমের এবং একঘেয়ে – অবশ্য সবসময় নয়। তিনি খুশি যে চলচ্চিত্রে আসার ব্যাপারে বাড়ির পূর্ণ অনুমোদন পেয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'এত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেছি সেটা ভালই। একটা সৃষ্টির কাজে জড়িয়ে আছি। কটা ছেলেমেয়ের ভাগ্যে এমন হয় ? তাদের বাবা-মা তো ঝি-চাকরের হাতে তাদের রেখে বেরিয়ে যান।'

খুকুর রোলেই সারিকার প্রথম পরিচিতি। এখন তাঁর মত হলো : 'একটা অস্বস্তিকর বয়সে পৌঁছে গেছি। আর খুকুর রোল করতে পারি না। কিন্তু বয়স্ক পুরুষদের সংগে যে প্রেম করব তাও পারি না। মুশকিল হচ্ছে, ভাল একটা চিত্রনাট্য পাচ্ছি না। দেখি, ১৯৮৫ সালে হয়তো একটা চিত্রনাট্য পাব যা আমার প্রতি সদয়।' 'দর্দ কা রিশতা' প্রভৃতি বহু ছবির বালিকা অভিনেত্রী খুশবু আজ অনেকগুলি ছবির নায়িকা। তিনি বলেন, 'ছবির সেটে গিয়েই সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ বোধ করি। সবাই চেনা লোক। মনে হয় একটা পরিবারের মতো।'

মুনমুন সেন অপেক্ষাকৃত দেরিতে বম্বেতে এসেছেন, কারণ তিনি আর কিশোরী নন। তবু অভিনয় তো তাঁর রক্তে। প্রথম ছবি 'অন্দর বাহার' দর্শকদের কিছুটা হতাশ করেছে, তবে মুনমুন ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নন। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, 'বাঃ, অন্য কী বা করব ? অবশ্য টুকটাক বিজনেস করা বা পোশাক ডিজাইন করা ইত্যাদির ইচ্ছে আছে।'

আশা সচদেব বলেন, তাঁকেও অভিনয় শিখতে হয়নি। মা রাজিয়া বেগম ছোটখাট চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন, উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন। দেখাদেখি আশাও তাই করে আসছেন। অবশ্য তিনি বলেন, তিনি এখনও পুরোদস্তর অভিনেত্রী হননি -- হওয়ার জন্য সাধনা করছেন। অনিতা রাজের বাবা অভিনেতা জগদীশ রাজ স্বয়ং তাঁর অভিনেত্রী হওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু ফিল্মি দুনিয়া অনিতার ভাল লাগে। তিনি বলেন, 'ছবির কাজে বেশ মজা পাই।

একদিন – সেদিন অবশ্য অনেক দূরে -- আজকের এই খুকু অভিনেত্রীরা মেদের পর্বত হবেন, দুবার-তিনবার করে বিবাহ-বিচ্ছেদ করবেন, তাঁদের চেহারা দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারবেন না একদিন এঁরাই ছিলেন রূপসী তন্বী। যাক, সে তো ভবিষ্যতের গর্ভে। আজকের বম্বে ছবির দর্শক এঁদের জন্য উন্মাদ।

এস এন খোসলা



অনুরাধা প্যাটেল / ফটো : শ্যাম [illegible]

ফটো : ইন্দ্রজিৎ [illegible]





সন্ধ্যা রায়

ফটো ঃ অর্ধেন্দু রায়



সন্ধ্যা রায়ের সুখ-দুঃখ

টালিগঞ্জের এম এন সেন লেনে 'সন্ধ্যা-নীড়' বাড়িটার দেড়তলার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, অভিজাত বৈঠকখানার কাঁচের জানালার বাইরে একটা সুন্দর বিকেলবেলা ফুরিয়ে যাচ্ছিল তিরতির করে। ঘরের মেঝেয় আইভরি লিনোলিয়াম-এর ওপর উঁচু ফোম-মখমল গদি। গদির ওপর কাশ্মীরী ফুলকারি করা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে মনে মনে কাউণ্ট ডাউন শুরু করলাম। জিরো ছাড়িয়ে মাইনাস-এর পথে যখন বেশ কিছুদূর গেছি, বাহারি পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন সন্ধ্যা রায়। পরনে গোলাপি রঙের ঢিলেঢালা ম্যাক্সি, দু-একটা ঘরোয়া গয়না। বিকেলের স্নান-পর্ব সবে সেরেছেন। ভিজে চুল পিঠের ওপর এলানো। মুখে কোনোরকম প্রসাধনের ছোঁয়া নেই।

খুব মিশুকে, আটপৌরে ভঙ্গিতে সন্ধ্যা বললেন, 'এর আগে দু-দিন অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল করেছি। আজও আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। কিছু মনে করবেন না, প্লিজ। মোটেও ভাববেন না, আমি মস্ত বড় স্টার, নিজের সেই ইমেজ রাখতে আপনাকে হ্যারাস করলাম। স্টার সিস্টেমটাকেই বিশ্বাস করি না। আমি আর্টিস্ট, এটাই



'গণদেবতা' ছবির একটি দৃশ্যে

আমার পরিচয়। আসলে এখন এত বেশি ব্যস্ত, চোখে-মুখে পথ দেখি না। সিনেমার ডেটস্, সংসার সামলানো, স্বামীর কাজে সাহায্য করা। তার ওপর জানেনই তো, 'কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে' অনুপকুমারের ডিরেকশনে 'ইন্দ্রাণী' নাটকে অভিনয় করছি। পাবলিক স্টেজে রেগুলার শো করলে বড্ড স্ট্রেন হয়!'

'আপনার অভিনয়ের ইমেজটা আমাদের কাছে স্পষ্ট। আটান্ন সালে রাজেন তরফদারের ছবি 'গঙ্গা' থেকে এই পঁচাশিতে অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টগরী' আটাশ বছরের কেরিয়ারে গ্রাম্য চরিত্রেই বোধহয় আপনি সবচেয়ে সফল?'

'গ্রাম বা শহরের মেয়ে, সব চরিত্রেই অভিনয় করেছি। কিন্তু সুখী হয়েছি কটা ছবিতে কাজ করে? মনের মতো ভূমিকা বেশি জোটেনি। যেসব চরিত্রে বৈচিত্র্য আছে, অভিনয় করতে গিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হই, সেগুলোই আমাকে টানে। তবে হ্যাঁ, সহজ, সরল গ্রামের মেয়ের রোলে একসময়ে স্ট্যাম্পড হয়ে গিয়েছিলাম। বা শহুরে হলেও আদর্শবাদী, নির্যাতিতা মেয়ে। যদিও প্রতিটা চরিত্রই ব্যক্তিত্বে, আচরণে, মেজাজে অনেকটা আলাদা। সেই ইমেজটাকে ভাঙলামও। তরুণ মজুমদারের 'একটুকু বাসা'র 'সংসার সীমান্তে', সলিল সেনের 'মণিহার', মঙ্গল চক্রবর্তীর 'তিন অধ্যায়' ছবির কথা নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার? অবিশ্যি গুড হার্টেড গ্রাম্য মেয়ের চরিত্র

আমাকে কেমন পেয়ে বসে!'

'গ্রাম বা গ্রামের মানুষের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ কতটা?'

'পশ্চিমবঙ্গ বা পূর্ববঙ্গের গ্রামের সঙ্গে, গ্রামের মানুষদের সঙ্গে আমার নাড়ির টান। তাঁদের জীবনযাপন, মানসিকতা, পরিবেশ আমার শৈশবের স্মৃতিতে আঁকা। তাঁদের সঙ্গে আমি একাত্ম। আজও গ্রামে শুটিং করতে গিয়ে অনেক মানুষের সঙ্গেই কেমন একটা আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব জন্মে যায়। ওঁদের সঙ্গে খোলামেলা আড্ডা মারি, সুখ-দুঃখের খোঁজ নিই। ওঁদের দাওয়ায় বসে মুড়ি, আলুভাজা খাই। মাটির ভাঁড়ে চা। মন ভরে ওঠে!'

'অভিনেত্রী হিসেবে নিজেকে কত্তদূর



'গণদেবতা' ছবির একটি দৃশ্যে অনুপকুমারের সঙ্গে

সফল বলে মনে করেন?'

'সামান্যই। সুযোগ না পেলে নিজেকে প্রমাণ করব কেমন করে? বছরের পর বছর অবাস্তব, জলো, তৃতীয় শ্রেণীর ছবি করে যাচ্ছি। বাংলায় এত চমৎকার সব গল্প-উপন্যাস, অথচ পরিচালকরা কোত্থেকে খুঁজে-পেতে রাবিশ গল্প যোগাড় করেন! কদিন আগে দুটো অসাধারণ উপন্যাস আবার পড়লাম। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি', গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'কলকাতার কাছেই'। এবং সমরেশ বসুর দুটো ছোট গল্পঃ 'অকালবৃষ্টি', 'উজান'। এই চারটে লেখা থেকেই দারুণ ছবি করা যায়।'

'তৃতীয় শ্রেণীর ছবিতে অভিনয় করতে কেমন লাগে?'

'চলচ্চিত্রের ভাষাটা যেসব পরিচালক জানেন, তাঁদের ছবিই প্রথম শ্রেণীর। বা সেগুলোকেই ছবি বলা যায়। বাকি সব 'বই'! পেটের দায়ে তা-ই করে গেলাম জীবনভর। কী আর করা! ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে!'

'তরুণ মজুমদারের প্রায় সব ছবিতেই আপনি অভিনয় করেন, স্ত্রী বলেই? অন্য অভিনেত্রীরা বঞ্চিত হচ্ছেন না?'

একটু যেন হোঁচট খেলেন সন্ধ্যা রায়। তারপরেই ধাঁ করে বলে বসলেন, 'তরুণবাবুর সব কটা ছবি দেখেছেন? কখনো বেমানান লেগেছে আমাকে? লাগেনি। দর্শকরাও ভীষণভাবে অ্যাকসেপ্ট করেছেন। গল্পের প্রয়োজনে মানানসই হলে আমি সিলেকটেড হই। নায়িকার রোলে, কখনো ছোটখাটো চরিত্রে। স্ত্রী বলে নয়। অন্য অভিনেত্রীদের বঞ্চিত হবারও কোনো কারণ নেই। মাধবী মুখোপাধ্যায়, সোমা দে বা সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন তরুণবাবুর ছবিতে। আবার অনেক শিল্পীকেই তরুণবাবু তৈরি করেছেন। মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, মহুয়া রায়চৌধুরী, দেবশ্রী রায়।'

'এখনও আপনি গ্ল্যামার-সর্বস্ব নায়িকার চরিত্র আঁকড়ে থাকবেন?'

'মুখই আমার চরম অস্ত্র। যেদিন আমাকে পঞ্চাশ বছরের বুড়ি মনে হবে, কোনো প্রোডিউসার বা ডিরেকটর আমার কাছে তিরিশ বছরের নায়িকার চরিত্র নিয়ে আসবেন না। তবে পঞ্চাশ বছর বয়সেও যদি আমাকে তিরিশ বছরের তরুণী দেখায়, গ্ল্যামার-সর্বস্ব নায়িকার রোল অ্যাকসেপ্ট করব না কেন? একজন প্রকৃত শিল্পী অবিশ্যি কখনোই রোম্যান্টিক নায়িকার চরিত্রে আটকে থাকতে পারেন না। যে-কোনো পাওয়ারফুল ক্যারেকটার রোলে আমি অভিনয় করতে রাজি। করছিও তো!'

'সিনেমায় গ্ল্যামার-এর প্রয়োজনীয়তা তাহলে স্বীকার করছেন?'

'একশোবার। তাবলে তিন ঘন্টা ধরে মেকআপ করে সুন্দরী হওয়া নয়। নিজের সৌন্দর্য বজায় রেখে, চরিত্র অনুযায়ী তৈরি করে নেওয়া।'

'ম্যাডাম, যদি কিছু মনে না করেন, আপনার সৌন্দর্যের বা বয়স ধরে রাখার ভেতরের ব্যাপারটা জানাবেন কী?'

এতটুকুও ধাক্কা খেলেন না। যেন এই তুমুল প্রশ্নটা অনিবার্যভাবে এসে পড়বে, জানতেন। মুচকি হেসে বললেন, 'আমার চিন্তা-ভাবনা, জীবনযাপন স্বাভাবিক, সুস্থ। তাই বোধহয় এমন আছি। ডায়েটিং করি। একবারে মাপ মতো সবজি খাই, সেই সঙ্গে প্রোটিন, ভিটামিন সি। মদ সিগারেট

"গ্রাম বা শহরের মেয়ে, সব চরিত্রেই অভিনয় করেছি। কিন্তু সুখী হয়েছি কটা ছবিতে কাজ করে? মনের মত ভূমিকা বেশি জোটেনি।"



ছুঁই না। রেগুলার যোগব্যায়াম করি। ম্যাসাজ নিই। লেট নাইট করি না। সব থেকে বেশি নজর দিই মনের ওপর। মন যদি খোলামেলা থাকে, জৌলুসও বাড়ে। মন বুড়ো না হলে, শরীর বুড়ো হয় না। তাছাড়াও আমার স্বামীর ভালবাসা, আদর-যত্ন, প্রেরণা।'

'বাঙালি মেয়েদের সৌন্দর্য, যৌবন প্রায়ই দেখেছি কেমন নড়বড়ে হয়ে যায় ফ্রাস্টেশন থেকে। আপনার জীবনে নিশ্চয়ই কোনো ফ্রাস্ট্রেশন নেই?'

'সৌন্দর্য, যৌবন বড্ড ক্ষণস্থায়ী। চেষ্টা করে-টরে হয়তো সময়টা খানিক বাড়ানো যায়। অবিশ্যি, কৈশোর যৌবন, বার্ধক্য – সবেরই একটা মাধুর্য আছে। যিনি উপভোগ করতে জানেন, তিনি ভাগ্যবান। আসলে আমার মনে হিংসা নেই, কাউকে ল্যাং মেরে এগিয়ে যাবার বাসনা নেই। তাই ফ্রাস্ট্রেশনও নেই। আটাশ বছরেও সাকসেসফুল অভিনেত্রী হতে পারলাম না বলে একটু দুঃখ আছে, সেটাকেও ফ্রাস্ট্রেশন বলব না। জীবনে যা পেয়েছি, যতটুকু পেয়েছি, হাসি মুখে মেনে

নেওয়াটাও এক ধরনের সুখ। হতাশার বদলে ঈশ্বর-চিন্তাই মানুষকে সতেজ রাখে।'

'আপনি বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম সারির একজন পরিচালকের স্ত্রী। এটা নিশ্চয়ই আপনার গর্ব?'

'একজন চলচ্চিত্রকারের স্ত্রী হিসেবে গর্বিতা নই। একজন আদর্শবান, পরিশ্রমী, সৎ মানুষের স্ত্রী বলেই আমার গর্ব, আনন্দ, সুখ।'

'আপনি আপনার পরিচালকদের কাছ থেকে কী আশা করেন?'

'সুস্থ চিন্তাধারা, কাজের পরিবেশ, ভাল ব্যবহার। এটুকুই।'

'আপনার দেখা টালিগঞ্জে বড় মাপের পরিচালক কে কে?'

'সত্যজিৎ রায়, রাজেন তরফদার। সত্যজিৎবাবুর একটা ছবিতেই অভিনয় করেছি, উনিশশো বাহাত্তর-তিয়াত্তর সালে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে 'অশনি সংকেত'। ওই একটা ছবিতে কাজ করে যে সুখ পেয়েছিলাম, জীবনে অনেক কিছু না-



"একজন চলচ্চিত্রকারের স্ত্রী হিসেবে গর্বিতা নই। একজন আদর্শবান, পরিশ্রমী, সৎ মানুষের স্ত্রী বলেই আমার গর্ব, আনন্দ, সুখ।"

পাওয়ার দুঃখ ভুলে গেছি। তাঁর কাজের পদ্ধতিটাই আলাদা। শুটিং-এর সময় একবারও মনে হল না অভিনয় করছি। তিনি ঠিক কী চাইছেন, সহজভাবে বুঝিয়ে দিলেন। চরিত্রটাকে ধরতে একটুও অসুবিধে হল না। কখন যেন মিশে গেলাম গাঁয়ের মেয়ে ছুটকির সঙ্গে। রাজেনবাবুর সঙ্গে কাজ করেও ভীষণ সুখী। তিনিই আমাকে প্রথম সুযোগ দিয়েছিলেন ফিল্মে। সমরেশ বসুর উপন্যাস থেকে 'গঙ্গা' ছবিতে। পরে তাঁর আরো দুটো ছবিতে অভিনয় করেছি। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাহিনী 'পালঙ্ক', সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্প নিয়ে 'নাগপাশ'। সত্যজিৎবাবুর মতো রাজেনবাবুরও চলচ্চিত্রের প্রতিটা বিষয়ের ওপর প্রচণ্ড দখল, আধিপত্য। এবং ছবির সব খুঁটিনাটি ব্যাপারেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সব চরিত্রের সঙ্গেই একাত্মতা। ফিল্ম অ্যাকটিংটা বোঝেন ভীষণ ভাল, শিল্পীদের অভিনয় করেই দেখিয়ে দেন।'

'যাঁদের সঙ্গে অভিনয় করেছেন, তার মধ্যে আপনার সবচেয়ে প্রিয় নায়ক কে?'

'বিশ্বজিৎ-সন্ধ্যা রায় রোম্যান্টিক জুটি বাংলা ছবির জগতে একটা জনপ্রিয় ঘটনা, তাই না? তখন আমরা দুজনেই নতুন এসেছি ফিল্মে, প্রায় সমবয়সীও, চমৎকার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল আমাদের। মুখের বন্ধুত্ব ছিল না বলেই মনের মিল আমাদের কাজের মধ্যেই ফুটে উঠত। বিশ্বজিৎ মানুষটা বেজায় ভাল, বড় আন্তরিক। আমার আরেক প্রিয় নায়ক উত্তমকুমার। গোড়ার দিকে কিছুদিন উত্তমবাবুর সঙ্গে কাজ করতে বড্ড ভয় লাগত। একে অত নামডাকওলা অভিনেতা, বাংলা ছবির একমাত্র ম্যাটিনি আইডল, তায় যা রাশভারী! কদিনের মধ্যেই তাঁর ভেতরের আসল মানুষটাকে চিনতে পেরে ভালবেসে ফেললাম। বন্ধু হয়ে গেলাম আমরা। ফিল্ম অ্যাকটিং-এর কত টিপস্ নিয়েছি তাঁর কাছ থেকে! নানাভাবে তিনি আমাকে ইন্সপিরেশন দিয়েছেন। সিনেমায়



'নিমন্ত্রণ' ছবিতে

রোম্যান্টিক অভিনয়ের অমন সেন্স টালিগঞ্জের আর কোনো অভিনেতার মধ্যে দেখিনি।'

'আপনার সমসাময়িক নায়িকাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লাগে কাকে?'

'মাধবী মুখোপাধ্যায়। তিনি একজন আন্তর্জাতিক মানের অভিনেত্রী। কিন্তু তাঁকে বড় একটা কাজে লাগানো হল না টালিগঞ্জে। তিনিও বয়সটা ধরে রাখতে পারলেন না বলে, চরিত্রাভিনয়ে চলে যেতে হল বড্ড তাড়াতাড়ি। আমার ভাবতে রোমাঞ্চ লাগে, সত্যজিৎবাবুর 'চারুলতা' ছবিতে মাধবীর ওই লেভেল-এর অভিনয় দেখে যুগ যুগ ধরে গোটা পৃথিবী তাঁকে মনে রাখবে!'

'টালিগঞ্জে যে মাপের অভিনয় হয়, সে বিষয়ে আপনার অভিমত কী? আপনিও তো লাউড অ্যাকটিং করেন?'

হৈ হৈ করে উঠলেন সন্ধ্যা: 'তখন যে বললাম, সিনেমার ভাষাটা জানেন মোটে কয়েকজন পরিচালক। যাঁরা মিডিয়ামটাই বোঝেন না, তাঁরা সিনেমার মাপে অভিনয় করাবেন কী ভাবে? অথচ ফিল্ম হল ডিরেকটরস মিডিয়াম। সিনেমায় তাই আমরা যাত্রা করি।'

'টালিগঞ্জের হিরোইনরা শুধুই মুখ আর মাথা নাড়েন কেন? ফিজিক্যাল অ্যাকটিং-এর ধার কাছ দিয়ে হাঁটেন না?'

'ভাল চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে, শিল্পের খাতিরে আমি প্রাণ ঢেলে অভিনয় করব। কিন্তু ফিজিক্যাল অ্যাকটিং করিয়ে নিতে জানেন ক-জন পরিচালক? তবে অহেতুক সেক্স আমাকে বোর করে।'

'বাংলা চলচ্চিত্রে, এমনকি সত্যজিৎ রায়ের ছবিতেও এখন যেভাবে চুম্বন, বেডসিন বা নর-নারীর ঘনিষ্ঠ দৃশ্য দেখানো হচ্ছে, আপনার কী রিঅ্যাকশন?'

'ভারতবর্ষে প্রপার এডুকেশন-এর অভাব, সেক্স খোলামকুচি হয়ে গেলে বিপদ বাড়বে। জীবনের ওই স্বাভাবিক, আশ্চর্য সুন্দর ব্যাপারগুলো সিনেমার পর্দায় না-ইবা দেখানো হল। তাছাড়া শিল্পের প্রয়োজনে নয়, টালিগঞ্জের অপদার্থ পরিচালকেরা ব্যবসার খাতিরে ছবিতে যৌনতা আনছেন, আনবেন। তবে সত্যজিৎবাবুর 'ঘরে বাইরে' ছবিতে নিখিলেশ – বিমলার চুম্বনের দৃশ্যটা খুব স্বাভাবিকভাবে এসেছে। শিল্প হয়ে উঠেছে।'

কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে উঠে পড়লাম ফোম-মখমলের আরাম ছেড়ে। ঘর থেকে বেরোবার মুখে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার অভিনয়ে জীবনের সবচেয়ে সুখের ঘটনা কোনটা? দুঃখের?'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সন্ধ্যা রায় বললেন, 'বিশেষ কোনো সুখের ঘটনার কথা মনে পড়ছে না এখন। তবে আমার জীবনের বড় সুখের সময় ছিল সেটা, যখন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়ের মতো বিরাট মাপের শিল্পীদের কাছে সিনেমার অভিনয়ের পাঠ নিয়েছি, অভিনয় করেছি তাঁদের সঙ্গে। আর দুঃখের ঘটনা? অনেক মনে পড়ছে। সেসব কাগজে ছেপে লাভ নেই।...... ও হ্যাঁ, হালের একটা দুঃখের ঘটনা বলতে পারি। অত খেটে-খুটে আঠারো শতকের পটভূমিকায় রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর জীবন ও সময়কে ঘিরে বাংলা গানের উত্তরণের গল্প ছবি করলেন তরুণ মজুমদার, উনিশশো চুরাশি সালে 'অমর গীতি'। ভারতের সবচেয়ে কালচার্ড জাতি বলে যাঁরা নিজেদের ঢোল পেটান, সেই বাঙালিরা ছবিটাকে রিফিউজ করলেন!' □

সুজয় সোম

ফটো : অশোক রায়

রবীন্দ্রজন্মোৎসব

রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে রবীন্দ্রসংগীতের যে জোয়ার এসেছিল, তা ছিল সুদূরপ্লাবী। আজ থেকে পনের বছর আগেও যেসব বাঙালির বয়স ষোল থেকে তিরিশের মধ্যে, তাদের একটা বড় অংশকে মাতিয়ে রাখত রবীন্দ্রসংগীত। কলকাতার এবং কলকাতার বাইরের মঞ্চে মঞ্চে তখন গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন রবীন্দ্রসংগীতের সেইসব শিহরণ জাগানো নাম—দেবব্রত-হেমন্ত-সুচিত্রা-কণিকা প্রমুখ। তাঁরাও তখন মধ্যগগনে। এঁদের প্রায় প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান তখন দর্শকপূর্ণ থাকত। সেই দর্শকের বেশির ভাগই ষোল থেকে তিরিশের মধ্যে। রবীন্দ্রসংগীত শেখারও যেন ধুম পড়ে গেল। ঠিক তখন থেকেই রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষ আয়োজন করলেন কবিপক্ষের। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠানগুলি হত। টিকিটের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যেত।

১৯৮৫ সালে যারা 'টিন-এজার' তারা কি রবীন্দ্রসংগীত শোনে? জানি না। তবে দেখলাম, রবীন্দ্রসদন আয়োজিত ষোল দিনব্যাপী রবীন্দ্রজন্মোৎসব অনুষ্ঠানে প্রেক্ষাগৃহ প্রায়ই অর্ধেকের বেশি ভরল না। এবং যাও-বা দর্শক ছিল তাদের কজনের বয়স তিরিশের নিচে? রবীন্দ্রসংগীত কিন্তু এখনও শেখে বাঙালিরা। চারদিকে অনেক প্রতিষ্ঠান। এবং রবীন্দ্রসদনের অনুষ্ঠানগুলিতেও অনেক নতুন শিল্পী গান গাইলেন। অনেকেরই কণ্ঠ ভাল, সুরেলা, শিক্ষাও বৈজ্ঞানিক। সবই আছে, শুধু সেই জিনিসটি নেই, যাতে যথার্থ শিল্পী হওয়া যায়। শ্রোতার মন কেড়ে নেওয়া যায়। অসংখ্য শ্রোতা দিনের পর দিন ফুল-হাউসে বসে মুগ্ধ হয়ে গান শুনবে, এমন ক্ষমতা বোধ হয় একজনেরও নেই। তাই আর শান্তিদেব- সুচিত্রা- হেমন্ত- দেবব্রত- কণিকা-সুবিনয় তৈরি হয় না। যেটা হয়, সেটা হল এঁদের নিষ্প্রাণ অনুকরণ।

যে সমস্ত শিল্পীর নাম ওপরে উল্লেখ করলাম, তাঁদের মধ্যে দু একজন ছাড়া আর সবাই অবশ্য এখনও গাইছেন, কিন্তু বয়সের ভারে তাঁরা জীর্ণ। অনেক দিয়েছেন তাঁরা, আর কিছু চাওয়াই অন্যায় তাঁদের কাছে। এঁদের ঠিক পরেই যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের অনেকেই বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেলেন। তাঁদের গান এখন শুনলে আমাদের দুঃখ হয়। মনে হয়, এত দীপ্তি নিয়ে এঁরা এসেছিলেন, এত তাড়াতাড়ি ম্লান হয়ে গেলেন কেন? আর এঁদের পরেই এক বিশাল শূন্যতা সে কথা আগেই বলেছি। কেন এমন হল? কেন আজ আর শিল্পী তৈরি হচ্ছে না এটা ভাববার সময় এসেছে। যোগ্য শিক্ষকের অভাব? না কি অত্যধিক স্বরলিপি অনুসরণ করার ফল? এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে বরং রবীন্দ্রসংগীত গাওয়াই কিছুদিন বন্ধ হোক। বাঙালির শ্রেষ্ঠ সাংগীতিক সম্পদকে এভাবে নষ্ট হতে দেওয়া যায় না।



প্রমিতা মল্লিক

এবার দেখা যাক, নয় থেকে চব্বিশ, এই ষোল দিনে আমরা কী পেলাম। ৯ মে প্রথম দিনের অনুষ্ঠানেই আমরা পেলাম উৎসবের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার মিতুল তালুকদারকে। মিতুলের মধ্যে সম্ভাবনা থৈথৈ করছে। যে কর্তৃত্ব নিয়ে 'শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা' গাইলেন তা চমক লাগায়। এত পরিণত নিবেদন এই বয়সে আমাদের অবাক করে। মিতুলের ভবিষ্যতের দিকে আমাদের আগ্রহ রইল। মৃগাঙ্ক সরকার কি রকম ঝটকা মেরে মেরে 'সংশয়তিমির মাঝে'-র মতো গান গাইলেন যা শ্রুতিকটু। ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠ সুন্দর, পরিশীলিত ভঙ্গিতে দুটি গানই গাইলেন। অভিরূপ গুহঠাকুরতার 'হরষে জাগো আজি' বলিষ্ঠ নিবেদন। গানটির প্রতি সুবিচার করেছেন তিনি। তুষার ভঞ্জ সর্বাংশে অসুস্থ ছিলেন, গান গেয়ে নিজেও কষ্ট পেলেন, আমাদেরও কষ্ট দিলেন। প্রবীণ শিল্পীদের মধ্যে অরবিন্দ বিশ্বাস ও গীতা ঘটক কেউই নিজেদের সুনাম অনুযায়ী গাননি। একমাত্র নীলিমা সেন ক্লান্ত কণ্ঠ নিয়েও শুধু নিবেদনের ভঙ্গিতে মুগ্ধ করলেন, বিশেষ করে 'পিপাসা হায় নাহি মিটিল'-তে।

১১ ও ১২ মে সকালে ছিল যথাক্রমে প্রেম ও প্রকৃতি পর্যায়ের অনুষ্ঠান। ১১ মে বাণীচক্র-র সম্মেলক দুইটি নিখুঁত পরিবেশন। এত ভাল সম্মেলক সমগ্র অনুষ্ঠানে আর শোনা যায়নি। চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায় আবার আমাদের কষ্ট দিলেন। অদিতি সেনগুপ্ত-র গলার সেই দাপট আর নেই। বুলবুল সেনগুপ্ত প্রাণের আবেগ ঢেলে চমৎকার গাইলেন 'কি রাগিণী বাজালে'। দেবারতি সোম সুকণ্ঠ ও সুশিক্ষার অধিকারিণী, কিন্তু 'নারে নারে ভয় করব না' অসম্ভব ঢিমে লয়ে ধরে গানটিকে নষ্ট করে ফেললেন। শ্রীপর্ণা ভট্টাচার্যর 'বুঝেছি বুঝেছি সখা' ও শ্যামশ্রী দাশগুপ্তর 'মনে যে আশা লয়ে' সুনিবেদন। নিরাশ করলেন মায়া সেন। আবার তেমনি পুষিয়ে দিলেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। 'বিরস দিন বিরল কাজ' তো অনবদ্য। শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ওগো তোমার চক্ষু দিয়ে' সার্থক পরিবেশন। 'কে যেতেছিস' গানটিতেও ছন্দের মজাটা তুলে ধরলেন। ১২ মের প্রভাতী আসরে এমন কোনো গানই কেউ শোনাতে পারলেন না যাতে হৃদয় ভরে যায়। তমালিকা গুহ 'ঐ যে ঝড়ের মেঘের' যেভাবে গাইলেন তাতে ঝড় তো এলই না, ঝিরঝিরে বৃষ্টিও এল না। প্রতিমা মুখোপাধ্যায় ও সুশীল মল্লিক আমাদের সেই পুরনো দুঃখবোধটাকে বাড়িয়ে দেন। এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণা মিত্র, কেউই সাধারণের স্তর ছাড়িয়ে উঠলেন না। ওরই মধ্যে নীলাঞ্জনা সেন, বিভাস ঘোষ তবু মোটামুটি গাইলেন। তন্ময় চট্টোপাধ্যায় তো বিপর্যয়কর। সংঘমিত্রা গুপ্ত ও কৃষ্ণা গুহঠাকুরতা পরিচ্ছন্ন পরিবেশন করলেন। সুশীল চট্টোপাধ্যায় বরাবরের মতো সেদিনও সুন্দর গাইলেন, বিশেষ করে 'গগনে গগনে আপনার মনে'। অর্ঘ্য সেনের 'বসন্তে কি শুধু' উচ্ছল পরিবেশন। তবে সেদিন যেন শবাধারে শেষ পেরেকটি ঠুকলেন গৌতম মিত্র। ওটা কী করলেন তিনি? ওই সুর, ওই গায়নভঙ্গি কোথায় পেলেন? (বিশেষ করে 'ঐ মৌমাছিদের ঘরছাড়া কে')। একি স্বরচিত রবীন্দ্রসংগীত? একি সুবিশাল ঔদ্ধত্য না সুনিবিড় অজ্ঞতা, কী বলব জানি না।

১৪ মে নাটক-নৃত্যনাট্যের গানের অনুষ্ঠানে আসর মাত করে দিলেন সুচিত্রা মিত্র। পরম স্ফূর্তিতে ছিলেন তিনি সেদিন, নির্বাচনেও ছিল অভিনবত্ব। নাটকের সম্মেলক গান গাইলেন, রচনার তারিখ উল্লেখ করে। শুভশ্রী মুখোপাধ্যায়কে অনেকদিন পরে এই আসরে দেখা গেল। গাইলেনও চমৎকার, বিশেষ করে চণ্ডালিকার অংশ। ধীরা মুখোপাধ্যায় দুটি গানই ভাল গাইলেন। সত্রাজিৎ বসু 'খোলো



সংঘমিত্রা গুপ্ত

খোলো দ্বার' গানটির লয়টি বড় সুন্দর ধরেছিলেন, গাইলেনও ভাল। উত্তরায়ণীর সম্মেলক 'এ শুধু অলস মায়া' সুশৃঙ্খল নিবেদন।

১৫ মে আবার প্রেম পর্যায়ের আসর। এদিন কিছু ভাল গান অনেকের কাছ থেকে পাওয়া গেল। বিভা সেনগুপ্ত নিজস্ব সাবলীল ভঙ্গিতে শোনালেন 'চৈত্র পবনে মম চিত্তবনে' ও 'তবু মনে রেখো'। তবে স্কেলটা তাঁর চড়া হয়ে গিয়েছিল। প্রমিতা মল্লিকও ভাল গাইলেন 'ওহে সুন্দর মম গৃহে'। অনুশীলা চট্টোপাধ্যায়ের 'মম দুঃখের সাধন' সুনিবেদন। গোপাল মহাপাত্র দুটি গানই পরিচ্ছন্ন গাইলেন। তাঁর গলায় সুশিক্ষার ছাপ স্পষ্ট। অপূর্ব গাইলেন শৈলেন দাস। তাঁর গানই এদিনের শ্রেষ্ঠ নিবেদন। তাঁর নির্বাচনও সুচিন্তিত। বাণী ঠাকুর 'দুজনে দেখা হল' সুন্দর গাইলেন। কিন্তু 'ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে'-তে 'দুরাশার' কে উচ্চারণ করলেন 'দুর-আয়-শায়'।

কেন ? শ্রীনন্দা মুখোপাধ্যায় সুন্দর কণ্ঠে নিখুঁত স্বরলিপি পাঠ করলেন। অভিজিৎ গুহ-র মনে রাখা দরকার 'কি ধ্বনি বাজিল'-র মতো গান গাইবার প্রজ্ঞা তাঁর আসেনি। তাঁর গলা অনেক জায়গায় সুরেই লাগে না। শর্মিষ্ঠা কর্মকার ও মণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় কি করে গাইবার সুযোগ পান তা বোঝা দুষ্কর। চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় আবার প্রমাণ করলেন তাঁর বিদায় নেবার সময় হয়ে গেছে।

১৯ মে সকালে বসেছিল বিচিত্র স্বদেশ-অনুষ্ঠান পর্যায়ের আসর। প্রথমেই ভাল লাগল প্রতাপ দে-র গান। তাঁর কণ্ঠটি ওরিজিন্যাল, বেশ সহজ সুন্দর ভঙ্গিতে গাইলেন। রতিকান্ত রায় চৌধুরী 'সুধাসাগর তীরে'-র পরেই 'নমো যন্ত্র নমো' ধরলেন কেন ? চিত্রলেখা দত্ত-র মধ্যে সম্ভাবনা প্রচুর, কিন্তু সেদিন গলা সুরে ছিল না। আশিস ভট্টাচার্য শিক্ষিত পরিশীলিত ভঙ্গিতে শোনালেন দুটি গান। চিত্রলেখা চৌধুরী খোলা গলায় 'নৃত্যের তালে তালে'-র মতো দীর্ঘ গান গাইলেন যা তাঁকে মানায়। 'ও ভাই কানাই' ও 'যে তোরে পাগল বলে'-ও জমিয়ে গাইলেন জোরাল ভঙ্গিতে। স্বপন গুপ্ত-র গান শুনে আবার মনে হল, কত তাড়াতাড়ি উনি ফুরিয়ে গেলেন। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় 'তোমার আসন' ও 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক'-এ লয় ও তাল নিয়ে একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেললেন। অত ঝুলিয়ে গাইলে গানের প্রতি সুবিচার হয় না সেটা তাঁর মতো অভিজ্ঞ শিল্পীর তো জানা। সেদিন কিন্তু অবাক করে দিলেন উজ্জয়িনী রায়। দৃপ্ত, বলিষ্ঠ গলা তাঁর, একেবারে নিজস্ব। 'স্বপনপারের ডাক শুনেছি' ও 'কৃষ্ণকলি', দুটি গানই একেবারে প্রভাবমুক্ত, ঝকঝকে পরিবেশন। 'তিমিরময় নিবিড় নিশা' মেঘ রাগে ঝাঁপতালে নিবদ্ধ একটি ধ্রুপদ-ভাঙা গান। মঞ্জরী লালের মতো প্রবীণ শিল্পীর জানা উচিত যে, বিস্রস্ত, বেসুরো কণ্ঠে এ গান গাওয়া যায় না।

২০ মে পূজার আসরে ভাল লাগল নবীন শিল্পী অনন্যব্রত দাসের গান। বিশেষ করে বাউলাঙ্গের 'আমার প্রাণের মানুষ' চমৎকার স্ফূর্তিময় নিবেদন। দেবস্মিতা ঘোষও বড় চমৎকার গাইলেন 'আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি'। সুন্দর অভিব্যক্তি, গলাও সুন্দর। ভাস্বতী মুখোপাধ্যায় অনাবশ্যক ঢোক গেলা বন্ধ করতে পারলে, ভাল শিল্পী হতে পারেন। সমরেশ রায় প্রধান শিল্পী। বিধ্বস্ত কণ্ঠ নিয়েও শুধু অভিজ্ঞতার জোরে আমাদের ভাল লাগালেন।



সত্রাজিৎ বসু



দেবস্মিতা ঘোষ

'সুখহীন নিশিদিন' গানটির গাম্ভীর্য ও এর শাস্ত্রীয় রীতি ধরতেই পারেননি বোধহয় রাজেশ্বর ভট্টাচার্য। 'সংশয়তিমির মাঝে' গাইতে যাওয়া অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনধিকারচর্চা। অত সীমিত ক্ষমতা ও বোধ নিয়ে এ গান কেন ? রনো গুহঠাকুরতা তাঁর গলার সেই মিষ্টত্ব হারিয়েছেন। 'তুমি এপার ওপার কর কে গো' তো বিপর্যয়কর পরিবেশন। 'দিন ফুরালো হে সংসারী' ধরে গাইলেন। খুব মনোযোগ দিয়ে কাজগুলো করলেন, কিন্তু সেগুলি মিলেমিশে মূল গানের সাথে একাত্ম হল না, প্রক্ষিপ্ত মনে হল। পূরবী মুখোপাধ্যায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মুগ্ধ করলেন 'ওরে ভীরু, তোমার হাতে' গানটিতে।

২২ মে প্রকৃতি পর্যায়ের আসরে মল্লারের সম্মেলক দুটি ভাল হয়েছিল। বন্দনা সিংহ-র 'ঐ বুঝি কালবৈশাখী'তে বাঞ্ছিত নাটক পাওয়া গেল। কুমকুম চট্টোপাধ্যায় কিন্তু সেদিন সবাইকে ছাড়িয়ে উঠেছিলেন। 'কোথা যে উধাও হলো' অসামান্য নিবেদন। কমলা বসু ও অমল নাগ, দুজনেই সুন্দর গাইলেন। অমল নাগের 'ঝরাপাতা গো'-র সঙ্গে নির্মল বিশ্বাসের মতো শিল্পী ওরকম বেসুরো এস্রাজ বাজালেন কেন ? সুমিত্রা সেন কখনই একটা মানের নিচে নামেন না। সেদিনও তাঁর অনবদ্য, সুরেলা গলায় পরিবেশন করলেন চারটি গান। চমৎকার লাগল 'শেষ গানেরই রেশ নিয়ে'। ওইদিনের অনুষ্ঠানটিই ছিল সংগীতের আসরের শেষ অনুষ্ঠান।

এর আগে ২১ মে ছিল কবিতাপাঠের আসর। প্রথম শিল্পী উৎপল কুণ্ডু-র যেমন অপূর্ব কণ্ঠ, তেমনি অভিব্যক্তি। তাঁর এদিনের নির্বাচনও ছিল সুচিন্তিত। তরুণ চক্রবর্তীও সুকণ্ঠের অধিকারী। এদিন বললেনও ভাল, বিশেষত 'হারিয়ে যাওয়া'। কাজল চৌধুরী তিনটি কবিতাই প্রায় একই সুরে বললেন। প্রণতি মিত্র মুস্তাফী সুদক্ষ আবৃত্তিকার, কিন্তু একজন প্রখ্যাতাত্তক মনে করিয়ে দেন। রত্না মিত্র-র প্রস্তাবনা সহ চিত্রাঙ্গদা কাব্যের অংশ পাঠ অনবদ্য। রজত বন্দ্যোপাধ্যায় একটু হাল্কা প্রেমের কবিতা শোনালেন। ভাল লাগল। বিজয়লক্ষ্মী বর্মনের 'এখানে নামল সন্ধ্যা' বেশ ভাল নিবেদন। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ও 'ভোরের পাখিতে' তিনি বড় বেশি উচ্ছল। পার্থ ঘোষ অভিজ্ঞ আবৃত্তিকার। কেন যে তিনি 'পরিশোধ'-এর মতো দীর্ঘ কবিতা বাছলেন বুঝলাম না, অনুষ্ঠান জমল না। গৌরী ঘোষ পলাতকার 'মুক্তি'-র পর শ্রোতাদের প্রবল অনুরোধে শোনালেন চিত্রা কাব্যের 'ব্রাহ্মণ'।



অভিরূপ গুহঠাকুরতা

দুটি নিবেদনই অনুপম। সব শেষে এলেন নীলাদ্রিশেখর বসু। এতক্ষণ কীরকম বুকচাপা, দুঃখ-দুঃখ ভাব ছিল, নিমেষে সেটা কেটে গেল যেন একরাশ বৈশাখী হাওয়ায়। 'পুণ্যের হিসাব', 'পুনরাবৃত্তি' ও পরে

শ্রোতাদের অনুরোধে 'পত্র'—তিনটি 'প' দিয়ে শুরু রচনা শোনালেন। এতক্ষণ যে রবীন্দ্রনাথকে পাচ্ছিলাম, তার বাইরে অন্য এক রবীন্দ্রনাথকে যেন পাওয়া গেল।

২৪ মে 'ইন্দিরা' মঞ্চস্থ করলেন 'দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠান। রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি অভিনব তাৎপর্য কিছু প্রাসঙ্গিক গান ও আলোচনাসহ নতুনভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছে। গ্রন্থনা থেকে উদ্ধৃত করি—"রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিপুল সমুদ্রে অন্তঃসঞ্চারী ঢেউয়ের প্রবলতায় যেমন পূজা আর প্রেমের ব্যবধান থাকে না, তেমনি দেওয়া নেওয়ার গানে কখন যে পরমের জায়গায় আসে মোহন, কখন যে পূজার ধূপগন্ধে লাগে প্রেমিকের স্পর্শ তা বুঝতে সময় লাগে।" অনুষ্ঠানটি নীরস লাগল। অনেক কথা ছিল, ছিল অনেক গান, কিন্তু সবটাই ছাড়া ছাড়া ধোঁয়াটে। অর্থাৎ গ্রন্থনা ও সঙ্গীত মিলে একটি সার্থক অনুষ্ঠানের যে নিটোল ভাবটি থাকে, তা একেবারে অনুপস্থিত ছিল। শুধু অর্ঘ্য সেনের 'তুমি কোন ভাঙনের পথে' ও ঋতু গুহর 'ওগো কাঙাল আমারে' কিছুক্ষণের জন্য আমাদের স্তব্ধ করে রাখে।

পরিশেষে জানাই, একদিনের অনুষ্ঠানে শিল্পীদের প্রায় সবাইকেই দেখা গেল আড়ষ্ট হয়ে স্বরলিপি অনুসরণ করার প্রবণতা। খোলা, উদাত্ত গলায়, প্রাণের আবেগে খুব কম শিল্পীকেই গান গাইতে শুনলাম। আর একটা কথা, গতবারের অনেক যোগ্য শিল্পী দেখা গেল এবার বাদ। অনেক অযোগ্য শিল্পী গাইবার সুযোগ পেয়েছেন। কোন্ যোগ্যতার নিরিখে এঁরা সুযোগ পেলেন আর কোন দোষে যোগ্য শিল্পীরা বাদ গেলেন বুঝলাম না।

এই ষোলো দিনে শিল্পীদের সঙ্গে যন্ত্রে সার্থক সহযোগিতা করেন সলিল মিত্র, নির্মল বিশ্বাস, সুকেশ জানা, বিপ্লব মণ্ডল, নালু মিত্র, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, রূপেন ঘোষ, রঞ্জন মজুমদার, রাজা রায়, কমল পণ্ডিত, অমল দেব, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, শীতল গঙ্গোপাধ্যায় ও পঞ্চানন বড়াল।

পার্থ সেনগুপ্ত

'কলকণ্ঠ'-এর নিবেদন

আমন্ত্রণ পত্রে লেখা ছিল, 'ছাব্বিশে মে ঠিক সন্ধ্যা ৬ টায়/যখন বাজবে ঘড়ি কাঁটায় কাঁটায়/শিশির মঞ্চে আমি সবারে ডাকি/খুঁজে দিতে আদরের সোনালী পাখি'। শিশু ও কিশোর কলা কুশীলবদের কাব্য নাটকের অনুষ্ঠান বয়স্ক উদ্যোক্তা-দের ব্যবস্হাপনার গন্ডগোলে যথা সময় আরম্ভ হতে পারেনি। নির্ধারিত সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা পরে অনুষ্ঠান শুরু হল বিনা মাইকে কবিপ্রণাম দিয়ে। অবশ্য কবি প্রণামে অংশগ্রহণকারী কণ্ঠশিল্পী, সংগত শিল্পী, গ্রন্থক ও আবৃত্তিকার সকলেই শৈশব ও কৈশোরের সীমারেখা অনেক আগেই অতিক্রম করেছেন। অনেকেই যুবা ও প্রৌঢ়। তিনটি রবীন্দ্র সংগীত, 'জন্মদিন' 'আফ্রিকা' কবিতা দুটি ও ভাষ্যপাঠ পরবর্তী শিশুশিল্পীদের অভিনয় মানের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেনি।

একটি সুন্দর কাব্যনাটক, রূপ-কথার মতো মায়াময় কাহিনীর মোহজালে সমস্ত দর্শককে ধরে রেখেছিল কলকণ্ঠের শিশু কুশী-লবরা। প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল সব শিশুর সুঅভিনয়ের গুণে নাটকটি সর্বাঙ্গীন শোভন হয়েছে। কোথাও ত্রুটি বা অসংগতি চোখে পড়েনি। বিশেষভাবে যেসব শিল্পীর অভিনয় মনকে নাড়া দিয়েছে তারা হলো, শ্রদ্ধা চাকী (মণিমালা), তৃণা বসাক (মন্ত্রী), অলকানন্দ চ্যাটার্জি (২য় সেপাই)। 'মণিমালা ও তার সোনালী ডানা' – কাব্যনাটকটির দৃশ্য পরিকল্পনাও প্রশংসনীয়।

সুব্রত রাহা

'ত্রিসপ্তক'-এর শহিদ-স্মরণ

বাংলা সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে শহর কলকাতার বুকে যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিজেদের আন্তরিকভাবে নিয়োজিত রেখেছেন, 'ত্রিসপ্তক' তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। গত ১৯ মে তাঁরা মাতৃভাষা আন্দোলনের বারোজন শহিদের অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন একটি ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এই নিয়ে পরপর তিন বছর এই অনুষ্ঠানটি করলেন ত্রিসপ্তক।

১৯৬১-তে শিলচরে মাতৃভাষা আন্দোলনে শহিদ হন কমলা ভট্টাচার্য, সুনীল সরকার, সুকমল পুরকায়স্থ, শচীন পাল, চন্ডীচরণ সূত্রধর, সত্যেন্দ্র দেব, কানাইলাল নিয়োগী, কুমুদ দাস, তরণী দেবনাথ, হিতেশ বিশ্বাস এবং ১৯৭২-এ প্রাণ দেন বিজন চক্রবর্তী। এদিনের অনুষ্ঠানের শুরুতেই বারোটি প্রদীপ জ্বালিয়ে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। উদ্বোধনী ভাষণে ত্রিসপ্তকের কর্ণধার ঋষিণ মিত্র ১৯ মে দিনটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। তারপর অমর শহিদদের উদ্দেশে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

আলোচনা, কবিতাপাঠ, আবৃত্তি, গান ও শ্রদ্ধা নিবেদনে সমগ্র অনুষ্ঠানটি একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণময়তা পেয়েছিল। বিশেষ করে নির্বাচিত কয়েকটি কবিতার গীতি-রূপ ত্রিসপ্তকের শিল্পীগোষ্ঠীর পরিবেশনায় ভিন্নতর মাত্রা যোজনা করেছিল। কোনো আলোচকই দীর্ঘ আলোচনায় অনুষ্ঠানকে ভারাক্রান্ত করে তোলেননি। তুলনায় কবিতা নির্বাচনে অধিকাংশ কবিই ছিলেন অমনোযোগী। 'মাছরাঙা পাখি, মাছ খাবি নাকি' – এই ধরনের ছড়াও নির্দ্বিধায় পড়ে গেলেন একজন।

অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন বসু। তিনি ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য, চরিত্রগত দিক নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। এছাড়াও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অপূর্বকুমার সাহা, অভিজিৎ ঘোষ, সমীর কাঞ্জিলাল, অসিতকুমার হালদার, গায়ত্রী চক্রবর্তী, সৃজন পাল প্রমুখ। কেউ কেউ তাঁদের বক্তব্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের এই অনুষ্ঠানটিকে একটি নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে না রেখে কোনো মুক্তমঞ্চে করার দাবি জানান। ঋষিণবাবু অনুষ্ঠান পরিচালনার এক ফাঁকে বলেন, মুক্তমঞ্চে তাঁর কোনো আপত্তি নেই কিন্তু সর্বাগ্রে জরুরি কাজটি হল সংগঠিত হওয়া।

সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রয়াসে এরকম একটি অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য শ্রীমিত্রের নিষ্ঠা ও পরিশ্রম অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। শহর কলকাতার আর কোথাও ১৯ মে স্মরণে কোনো অনুষ্ঠান হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। কোনো সংবাদপত্রে ১৯ মে সম্পর্কে লেখা এক লাইনও চোখে পড়েনি। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েকশো বাংলাভাষাপ্রেমীকে সেদিন যেভাবে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেখেছি, তাতে আশা জাগে বাংলাভাষা তার গৌরবের সবটুকু হারিয়ে ফেলেনি।

মৃণালকান্তি দাশ

ঐকিক-এর অপপ্রয়োগ

'ঐকিক' নাট্যসংস্হা সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় কলামন্দির বেসমেন্ট হলে 'বিন্যাস' (কাহিনী : বুদ্ধদেব গুহ, নাট্যরূপ ও নির্দেশনা : প্রবীর চক্রবর্তী) নাটকটিকে যেভাবে মঞ্চস্থ করলেন তা কোনভাবেই আধুনিক প্রযোজনার শর্ত পালন করেনি। প্রযোজনাটিতে নাট্যরূপের দুর্বলতা যেমন প্রকট হয়ে উঠেছিল তেমনিই অভিনয় শিল্পীদের ব্যর্থতাও আগাগোড়া নাটককে প্রাণহীন করে রেখেছিল।

অভিনেতা অভিনেত্রী যাঁরা অংশ নিয়েছেন দু-একজন ছাড়া তাঁদের অভিনয় সম্পূর্ণই প্রাথমিক পর্যায়ের। খামতি ঢাকতে প্রায় প্রত্যেকে উচ্চগ্রামে অভিনয় করেছেন। এমনকি শিল্পীরা পার্ট মুখস্হও করেননি। জোরালো প্রমট শুনে (দর্শক আসনে বসেও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল) তাঁরা সংলাপ বলছিলেন। উনিশজন চরিত্র-শিল্পীর মধ্যে প্রবীর চক্রবর্তী, প্রদীপ মন্ডল এবং শর্মিলা দত্ত কিছুটা মানিয়ে অভিনয় করার চেষ্টা করেছিলেন।

দর্শকের চোখের সামনে বারবার যেভাবে দৃশ্যসজ্জার পরিবর্তন করা হল তা শুধু দৃষ্টিকটুই নয় – মনে হচ্ছিল সংস্হার সদস্যদের মঞ্চে নাট্য প্রযোজনা করার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। সারাটা নাটক জুড়ে শুধু খাপছাড়া অনিয়মের রাজত্ব।

অভিনয় শিল্পীদের হাঁটাচলা, কথাবার্তা সবকিছুতেই আড়ষ্টতা। কেউই নাটকের গভীরে ডুবতে চাননি। এঁদের অভিনয়ের ছকটা অনেকটা স্বরলিপি পাঠ করে গান করার মতো। মেক-আপ খুব খারাপ। বেশ কয়েকটি চরিত্রকেই এমনভাবে চোখে মুখে রঙ করা হয়েছে যা সেই সব চরিত্রের সঙ্গে কোনভাবেই মানানসই নয়। একটি দৃশ্যে মিঃ রায় এবং মিঃ দত্তর মাথায় পরচুলা পরানো হয়েছিল ক্লিপ এঁটে। দর্শক আসন থেকে মাথার ক্লিপগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। মঞ্চসজ্জাও ছিল অত্যন্ত সাদামাটা, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নাটকের মতোই একঘেয়ে। ঘনশ্যাম পাইনের আবহ ভাবনাও বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।

অমল মুখোপাধ্যায়

সজ্জা : সুবীর চট্টোপাধ্যায়

যোগসূত্র



বাণীব্রত চক্রবর্তী

সিঁড়িতে অন্ধকার। পুরনো আমলের বাড়িতে যেরকম সিঁড়ি হয়। বিপজ্জনক ধাপ এবং অন্ধকার ছাড়াও সিঁড়িতে ড্যাম্প। তবে অন্ধকার নিরেট নয়। দোতলার বারান্দা থেকে আলোর ছিটেফোঁটা এখানে এসে পড়েছে। বারান্দায় চেয়ারে বসে পুরন্দর চা খাচ্ছিল। চা খেতে খেতে দেখতে পেল সেই দৃশ্য। মাঝে মাঝে স্বপ্নে যে দৃশ্য দেখে অনেকটা সেইরকম। তবে এটা স্বপ্ন নয়। সন্ধেবেলায় চা খেতে খেতে পাগলেও স্বপ্ন দেখে না। অথচ স্বপ্নের মত অন্ধকার ঠেলে ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছে জয়া। জয়ার মুখ ঘর্মাক্ত, চোখে ক্লান্তি। অন্ধকার একটা গহ্বর থেকে জয়া এইমাত্র উঠে এল।

অন্ধকার গহ্বরটা পুরন্দরদের বাড়ির সিঁড়ি।

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে পুরন্দর ফ্যালফ্যাল করে জয়ার দিকে তাকিয়েছিল। জয়ার মনে হল বয়স ক্রমশ সমস্ত উদ্দীপনা শোষণ করে নেয়। ক্লান্তির দুটি বিশাল ডানা এখন তাকে ঢাকবার চেষ্টা করছে। পুরন্দরের বিহ্বলতা কেটে যেতে দেরি হয়নি। সে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বসো জয়া।'

জয়া বসল। কিন্তু ঐ বসা সার। একটা কথাও বলতে পারল না। কী বলবে সে? সে কোনো কথা বলতে পারল না। নববধূর মতন মুখ নিচু করে বসে রইল। পুরন্দরও সপ্রতিভ হতে পারে না। কোনো রকম তৎপরতা দেখাতে পারে না। সন্ধ্যার অন্ধকার একটু একটু জমছে। জীর্ণ বারান্দায় একটা অযোগ্য মিটমিটে আলো। খিলানে, ঘুলঘুলিতে পায়রাদের বকবকানি।

আগেকার খণ্ড স্মৃতি অখণ্ড আলাপ এবং ভালবাসা কুড়িয়ে কুড়িয়ে যদি দুজনে একটা মালা গাঁথে তবে সেটা দোষের নয়। সেটা আহামরি নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের ভিতরে এইরকম ভালবাসার গল্প পাওয়া যায়। সাধারণ, নিতান্তই সাধারণ। সাধারণ হবে না কেন। ওরাও যে সাধারণ, জয়া ও পুরন্দর তখন স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন শুধু নিদ্রায় থাকে না। স্বপ্নের আর একটা জগৎ আছে কল্পনায়।

দুজন এখন নির্বাক হয়ে পায়রাদের হিংসে করতে পারে। পায়রাদের বকবকানি থামছে না। বকম বকম করে ওরা কী যে বলছে সে ওরাই জানে। সেদিন নিশ্চয়ই জয়া ও পুরন্দর এই পায়রাদের মতন ছিল। কথা, কথা আর কথা। গালগলা ফুলিয়ে কেবলই কথা। আর উড়ে যাওয়া। অবাধ, স্বাধীন, ভাসমান। আকাশ এত বিরাট বলে পায়রাদের আনন্দ। আকাশ এমন উঁচু তাই পায়রাদের সুখ। আকাশ বিরাট, অবাধ। তবে চিল শকুনের ভয় আছে। কিন্তু পথ হারানোর ভয় নেই। আকাশে অন্ধকার জমতে শুরু করলে ওদের নামার পাল্লা। তারপর ওরা ঠিক খুঁজে নেয় যে যার আস্তানা। একটুও ভুল হয় না।

অনেকদিন আগে পুরন্দর জয়ার হাতটা মুঠোয় চেপে ধরেছিল। অনতিদূরে ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিসৌধ। কাছাকাছি মাটির নিচে পল্টনদের আস্তানা। দুজনে পাশাপাশি বসেছিল। তখনও ওদের বিবাহবন্ধন ঘটেনি। গল্প করছিল। পুরন্দরের স্পর্শ জয়ার ভিতর শিহরণ জাগায়। জয়া কেঁপে উঠেছিল। হালকা হাওয়ায় সেদিন নিশ্চয়ই বাগানের গাছের পাতা কেঁপেছিল। ফুলের পাপড়ি কাঁপিয়েছিল, মত্ত ভ্রমর। ঐ একই হাওয়া স্মৃতিসৌধের মর্মরকে ছুঁয়ে জলাশয় ছুঁয়ে ওদের স্পর্শ করেছিল। পুরন্দরের ভারী ইচ্ছে হয়েছিল জয়াকে নিবিড় আলিঙ্গনে চুম্বন করার। সামলে নিয়েছিল। ব্যাপারটা বড় ছেলেমানুষি হয়ে যাবে। অথবা তার চেয়েও বড় কথা স্টিট রোমিও হওয়ার অপবাদ।

এখন প্রত্যেকদিন অফিস থেকে ফিরে সন্ধেবেলায় বারান্দায় বসে চা খাওয়া পুরন্দরের রুটিনের মধ্যে পড়ে। জয়া এ বাড়ি চেনে, থেকেছেও। তবে জয়ার চোখে কালীঘাটের ফ্ল্যাটটা ভাসছে। ট্রাম ডিপোর উল্টোদিকে সহদেববাবুদের দোতলায় তাদের সংসার। পুরন্দর এখনও অফিস থেকে ফেরেনি। জয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। একের পর এক ট্রাম চলে যাচ্ছে। কিন্তু কোথায় পুরন্দর? ব্যাকুলতা বাড়িতে বাড়তে তৈরি করছে উদ্বেগ। উদ্বেগ সঞ্চয় করছে দুঃশ্চিন্তা। জয়া অস্থির হয়ে উঠছে।

সাবেক বাড়ির এই ঘর দেখে একদিন জয়া নাক সিঁটকে ছিল। বুড়ো বাবা-মাকে ফেলে পুরন্দর জয়াকে নিয়ে আলাদা হয়েছিল। জয়া জানে, সপ্তাহে অন্তত তিনটে দিন পুরন্দর আশুবাবু লেনে ছুটে যায়। খিদিরপুরের আশুবাবু লেন থেকে বেরিয়ে কালীঘাটের ট্রামে ওঠে।

পুরন্দর অনেকটা হালকা হতে পারে। বাবা, মা ও ছোটবোন অরুকে দেখলে, ওদের সঙ্গে বসে গল্প করলে মনের ভিতরে কেন আনন্দের ঢেউ বয়? সবচেয়ে বড় কথা পুরন্দর যখন বাবার হাতে টাকা তুলে দেয়, অরুর জন্যে কিছু একটা নিয়ে যায় কিংবা মায়ের কাছে বসে খায় তখন মন থেকে অপরাধবোধটা হালকা হয়। নিজেকে বেশ প্রফুল্ল লাগে।

জয়াকে এখানে মানায় না। জয়া যেন তাকে আগলে রেখেছে। পুরন্দর জানে কালীঘাটের ভাড়া বাড়ির দোতলায় জয়া সতৃষ্ণ নয়নে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে।

অনেক সময় পুরন্দর ভেবেছে কে আমার আপন?

আশুবাবু লেনের বুড়োবুড়ি আর যোগমায়া দেবী কলেজের ছাত্রী অরু না জয়া? জয়া কে? পঁচিশ বছর বয়সের আগে পুরন্দর জয়াকে

চিনত না। জয়ার তখন কুড়ি।

একজন তরুণের সঙ্গে আর একজন তরুণীর যেভাবে আলাপ হয় তাদেরও আলাপ সেইভাবে।

ডালহৌসির বাসস্টপে প্রত্যেক বিকেলে দুজনের দেখা।

জয়া জি পিও-র সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসছে। পুরন্দর দাঁড়িয়ে আছে। খাম পোস্টকার্ড স্ট্যাম্প বিক্রির হিসেব চুকিয়ে অবসন্ন বিকেলে ক্লান্ত পায়ে একটা মেয়ে সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসছে। জেনারেল পোস্ট অফিসের ঐতিহাসিক ঘড়িতে তখন পাঁচটা বেজে গেছে। রাইটার্সের লালবাড়িটা থেকে পুরন্দর বেরিয়ে এসেছে এই কিছুক্ষণ আগে।

তারপর কোনো কোনোদিন দেরি করে বাড়ি ফেরা। কার্জন পার্কে বসে বাদাম খেতে খেতে গল্প। ছুটির দিনে সিনেমার অন্ধকার ঘরে পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে উত্তম-সুচিত্রা রিচার্ড বার্টন– এলিজাবেথ টেলরের রাজ্যে চলে যাওয়া।

ভাল লাগাটাই পৌঁছে দেয় মুগ্ধতায়। মুগ্ধতার সিঁড়ি বেয়ে ওরা ভালবাসায় পৌঁছে যায়। তখন আশুবাবু লেনের বুড়োবুড়ি বা কলেজে পড়া বোনটির কথা মনে পড়ে কি?

বিয়ের পর সময় এবং ঘটনা পুরন্দরকে একে একে অনেক কিছু চিনিয়েছে। বাবা মা ও অরু যে এত আপন আগে জানা ছিল না। অফিস থেকে যেদিন সে ছুটে চলে যেত আশুবাবু লেনে, সেদিন জয়া অধীর অপেক্ষায় অপেক্ষায় কালীঘাটের বাড়িতে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়ত, সেদিন কী তা পুরন্দর বোঝেনি?

আবার কোনো কোনোদিন সন্ধে হতে না হতেই অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় জ্যামে ট্রাফিক অনড় অচল হয়ে এই পুরন্দরই জয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়েছে। মনে হয়েছে জয়াই সব। জয়া ছাড়া তার আর কেউ নেই। জয়া একেবারে একা। কালীঘাটের ছোট সংসার। অমায়িক ল্যান্ডলর্ড সহদেব বক্সী। দুখানি ছোটঘর। এক চিলতে বারান্দায় জয়া সাধ করে গোলাপের টব বসিয়েছে। জয়া এখন কি করছে? বাথরুমে গা ধুচ্ছে কি? হয়তো গা ধোয়া হয়ে গেছে। ফর্সা শাড়ি পড়ে চুল বেঁধে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

বাবা ও মাকে শত্রু বলে মনে হয়েছে। হাড়ভাঙা খাটুনির পর বউ বাড়ি ফিরলে কই মা কিংবা অরু তো ছুটে আসে না। বউদিকে এক কাপ চা কী করে দিতে পারে না? বউমার প্রতি বাবারও টান নেই। সুতরাং জয়ারই বা থাকবে কেন?

বিয়ের ছমাস পরে জয়া যদি আলাদা হতে চায় অন্যায় নয়। তাছাড়া জায়গার অভাবটাও কী একটা ব্যাপার নয়? আশুবাবু লেনে দুখানি বড় বড় ঘর। কিন্তু মানুষ? মানুষতো দুজন নয়। বুড়োবুড়ির অনেক ফ্যাচাং। মায়ের শুচিবাই। অরুর একটা নিজস্ব পড়ার জায়গা চাই। ফলে নববিবাহের সমস্ত রোমান্স এই বন্ধতায়, সাংসারিকতায় পিষ্ট। জয়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবতে হবে। বাবার সারারাত ধরে কাশি। মায়ের হাজারো ফরমাশ। অরুর নিষ্ঠুর নিস্পৃহতা। এসবের মধ্যে জয়া কী বাঁচতে পারে? সংসারে নেই নেই আর অভাবের চিৎকার। দাও দাও সব দাও। হাহাকার। এসবের মাঝখানে পুরন্দরের আনন্দ নষ্ট হয়। জয়াকে গভীরভাবে পাওয়া হয় না। এমন পরিবেশে পুরন্দর ও জয়া পরস্পরের কাছে কেমন করে আপন হয়ে উঠবে?

সুতরাং আশুবাবু লেনের নরক থেকে ওরা যদি কালীঘাটের স্বর্গোদ্যানে যায় দোষ দেওয়া যায় না।

সেই জয়া বহুকাল বাদে আবার আশুবাবু লেনে এসেছে। পুরন্দরের টাকমাথা ঘিরে একমুঠো কালোজিরের মতন মশা উড়ছে। আজ বাবা মা নেই। সমস্তিপুরের শ্বশুরবাড়িতে অরু দাপটে সংসার করছে। আজ পুরন্দর একা। কাগজপত্রে জয়ার সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক চুকে গেছে। জয়া বসে আছে পুরন্দরের সামনেই একটা পুরনো চেয়ারে। সকালবেলায় এই চেয়ারটিতে বসে– পুরন্দরের বাবা খবরের কাগজ পড়তেন। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ইংরিজি কাগজ পড়া শ্বশুর মশায়ের বাতিক ছিল।

পুরন্দর কোনো কথা বলতে পারছিল না। সরাসরি জয়ার দিকে তাকাতেও পারছিল না। সে একদৃষ্টিতে খিলানের উপর উপবিষ্ট পায়রাগুলির দিকে তাকিয়েছিল। পায়রাগুলি গালগলা ফুলিয়ে এখনও বকমবকম করছে। জয়া মানুষটাকে দেখছিল। একদিন এই মানুষটাই তার জীবন জুড়ে ছিল। তার স্বামী পুরন্দর। এরই মধ্যে মানুষটা কেমন বুড়িয়ে গেছে। চোখে সেই জ্যোতি নেই। দৃষ্টিতে প্রৌঢ় ক্লান্তি উঁকি মারছে।

একদিন ইনি আমার ছিলেন। হ্যাঁ, আমার। এঁর সব আমি জানি। এঁর রাগ, এঁর হতাশা, আনন্দ, আদরের ধরন, মত্ততা, দুর্বলতা, শক্তি সব সব আমার জানা। আচ্ছা, এখনও কী এই মানুষটা দুঃখের গল্প পড়তে পড়তে চোখ ভিজিয়ে ফেলেন? এখনও পুরন্দর বিছানায় পাশ বালিশ ছাড়া ঘুমোতে পারে না? এখনও দাঁত তুলতে ভয় পায়?

দুটি পায়রা এবার পরস্পরের চঞ্চুতে চঞ্চু স্পর্শ করছে। ওরা চুম্বনোদ্যত হতেই লজ্জায় এবং কেন জানিনা কিছুটা ভয়ে পুরন্দর মুখ ফেরাল। আর মুখ ফেরাতেই দেখতে পেল জয়ার ক্লান্ত অবসন্ন মুখ। এ কোন জয়া? এই জয়াকে পুরন্দর চেনে না। পুরন্দর যে জয়াকে চেনে তার চোখে গভীর দৃষ্টি। মদির ওষ্ঠে লাস্য। মাঝে মাঝে লজ্জায় নম্র হওয়া। সংসার নিয়ে মেতে থাকা আর একটা অন্য মেয়ে। কালীঘাটের বাড়ির সেই ঘর। সেই ড্রেসিং টেবিল। খোঁপা বাঁধছে জয়া। কত যত্নে, সতর্কতায় আনন্দে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে শাড়ির কুঁচি ঠিক করছে কিংবা মুকুরের কাছে ঠোঁট এগিয়ে এনে লিপস্টিক লাগাচ্ছে। ছুটির দুপুরে অথবা মধ্যরাত্রে আচমকা ঘুম ভেঙে পুরন্দর মুগ্ধ চোখে দেখছে জয়াকে। নিষ্পাপ একটি মেয়ে ঘুমে অচেতন। বুকের উপর থেকে আঁচল সরে গেছে। পায়ের উপর থেকে শাড়ি সরে গিয়ে প্রকাশিত হয়েছে নিটোল ফর্সা রোমহীন পা। ফ্যানের হাওয়ায় এলোচুল উড়ছে। কিন্তু এ জয়া তো সে জয়া নয়।

'কেমন আছ?' এই কথাটুকু বলতে জয়াকে যে চেষ্টা করতে হল তা মর্মান্তিক। অথচ এছাড়া ভূমিকায় কি বলা যায়। পুরন্দর বলল, 'ভাল। তুমি কেমন আছে?'

জয়া করুণ চোখে তাকাল। ঠোঁট কেঁপে উঠল। তারপর বলল, 'একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি।'

পুরন্দর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। ভিতরে ভিতরে অস্থিরতা বোধ করে। জয়া কী তাকে অস্থির করে তুলছে? কেন তুলছে? জয়া তো এখন তার কেউ নয়।

পুরন্দর জিজ্ঞেস করল, 'চা খাবে?'

জয়া বলল, 'না।'

পুরন্দর জয়ার কথা শুনল না। চেয়ার ছেড়ে ঘরে গেল। জয়া চুপ করে বসে থাকে। পুরন্দর কী চায়ের ব্যবস্থা করতে গেল? বাড়িতে আর কে আছে? জয়া জানে পুরন্দর একা, ছাড়াছাড়ির পর বিয়ে করে আর একটি সংসার তৈরি করার মানুষ পুরন্দর নয়। দূর থেকে সব খবরই পেয়েছে সে। অরুর বিয়ে, মা ও বাবার মৃত্যু। আজও জি পি ও-র সিঁড়ি ভেঙে তাকে বাস স্টপে এসে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু পুরন্দর কোথায়? পুরন্দর রাইটার্সে আছে। মামাতো ভাই মহিমেরও অফিস ঐ বাড়িতে। পুরন্দরকে মহিম মাঝে মাঝে দেখতে পায়।

জয়া আর চুপ করে বসে থাকতে পারে না। ঘরে গিয়ে অবাক হয়। ঘরের চেহারা দেখে চোখ ফেটে জল আসতে চায়। সবচেয়ে কষ্ট হয় পুরন্দরকে দেখে। পুরন্দর উবু হয়ে বসে স্টোভ ধরাচ্ছে। মাথার টাকটা এখন স্পষ্ট। কাঁধের রোগা উঁচু হাড়। লোকটা একটা স্টোভ ধরাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। জয়ার মনে হল ছুটে যাই। পুরন্দরকে সরিয়ে স্টোভ ধরাই। এই অগোছালো ঘর গুছিয়ে দিই। জয়া এগোতে পারল না। কিংবা বারান্দায় ফিরে যেতেও পারে না। চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে রইল। ততক্ষণে পুরন্দর স্টোভ ধরিয়ে ফেলেছে। চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছে। তারপর মুখ ঘুরিয়েই জয়াকে দেখতে পেল। 'তুমি?' পুরন্দর লজ্জা পেয়ে গেল। জয়া অনেক কষ্ট করে হাসল এবং সহজে এবার


যোগদান করুন
মদুরা কোট্‌স
'অ্যাংকর'
এমব্রয়ডারি
প্রতিযোগিতায়
পুরস্কারের মোট মূল্য
১,০০,০০০ টাকা !
প্রতিযোগিতা শুরু—১লা মে, ১৯৮৫
যোগদানের শেষ তারিখ—৩১শে জুলাই, ১৯৮৫
৫টি প্রথম পুরস্কারঃ প্রতিটি ১০,০০০ টাকা
৫টি দ্বিতীয় পুরস্কারঃ প্রতিটি ৫,০০০ টাকা
৫টি তৃতীয় পুরস্কারঃ প্রতিটি ২,০০০ টাকা
৫০টি স্বান্তনা পুরস্কারঃ প্রতিটি ২০০ টাকা
১০০টি স্বান্তনা পুরস্কারঃ প্রতিটি ১০০ টাকা
বিশদ বিবরণ ও ভর্তি ফর্মের
জন্যে আপনার নিকটবর্তী
অ্যাঙ্কর ডীলারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন!
কোনো ভর্তি ফি নেই!
CHAITRA-K MCL 185 BEN

এগিয়ে যেতে পারল। পুরন্দর বাধা দিতে পারল না। জয়া কোমরে আঁচল জড়িয়ে চা করতে শুরু করল।

দুজন চায়ের কাপ নিয়ে আবার বারান্দায় এসে বসল।

পুরন্দর এখন অনেকটা স্বাভাবিক হতে পেরেছে। মনে হয় জয়াও। চায়ে চুমুক দিয়ে পুরন্দর জিজ্ঞেস করল, 'এবার বলো, কী বলবে?'

জয়ার মুখ ঈষৎ ভারী হয়। থমথমে মুখ আবার আনত। পুরন্দরের কথার উত্তর দিল না। মুখ নিচু করে নোখ খুঁটছে। জয়া ও পুরন্দর অতীতের দিকে মুখ ফেরাতে চায় না। আলাদা সংসার ওদের আপন করতে পারেনি। আশুবাবু লেনের আকর্ষণ পুরন্দরকে জয়ার কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। পুরন্দরও ক্রমশ টের পেয়েছিল জয়ার আত্মকেন্দ্রিকতার মর্মগুলি। জয়ার স্বার্থপরতা তাকে দিনের পর দিন পীড়িত করেছে। পুরন্দর স্বস্তি পায়নি, শান্তি পায়নি। তাছাড়া ডিভোর্সের সপক্ষে জয়া একটা বড় যুক্তি মুঠোয় পেয়েছিল। পুরন্দর জয়ার গর্ভে সন্তান সৃষ্টি করতে পারেনি। পুরন্দরের অক্ষম পৌরুষ সংসারে অশান্তির অগ্নিকণা সংগ্রহ করে একদিন অগ্নিকান্ড ঘটিয়ে ফেলে।

কালীঘাটের ফ্ল্যাট ছেড়ে জয়া বাবার কাছে চলে যায়। এখন আবার যেন জয়ার উগ্র স্বার্থপরতাকে দেখতে পেল পুরন্দর। গম্ভীর হয়ে জয়ার দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'এবার তোমার কথা বলো।'

জয়া কেঁপে ওঠে। কিন্তু আর সংকোচ করা চলে না। জয়া বলল, 'বাবা একবার তোমাকে ডেকেছেন।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ, তোমাকে। বাবার সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি পার দেখা কর।'

জয়ার কথাটা অনুরোধকে অতিক্রম করে আদেশ হয়ে উঠছে কি? পুরন্দর বিরক্ত হয়। কৌতূহলী হয়। বিস্মিতও।

'কেন?'

'কেন ডেকেছেন জানি না। তবে যদি যাও তবে আর দেরি কোরো না।'

পুরন্দর কোনোদিন শ্বশুরমশাইকে বাবা বলে ডাকেনি। জয়ার মায়ের অভাবটা শশাংকমোহনই পুষিয়ে দিয়েছিলেন। সব সম্পর্ক চুকে যাবার পর যাঁর চোখে জল দেখা গিয়েছিল তিনি শশাংকমোহন। অশান্তিপর্বে অনেকবার এই বৃদ্ধ পুরন্দরের কাছে এসেছেন। না, পুরন্দর তাঁর কথা রাখতে পারেনি। জয়ার সঙ্গে মানিয়ে চলা সম্ভব নয়।

পুরন্দর বলল, 'যাব। উনি কোথায় আছেন?'

জয়া নম্র কণ্ঠে কেঁপে কেঁপে বলল, 'বাড়িতে। হাসপাতাল ওঁকে আর রাখল না।'

সন্ধেবেলায় তর্করত্নের গলিতে ঢুকে পুরন্দর সংকুচিত হয়ে গেল। জয়াদের বাড়িটা গলির এক কোণে। জয়াকে কথা দেওয়ার পরের দিনই শশাংকমোহনের কাছে যায়নি। কয়েকদিন পরে আজ এসেছে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পুরন্দর কড়া নাড়বে কি না ভাবছিল দরজা খুলে গেল। পুরন্দর জয়ার দিকে এক ঝলক তাকিয়েই সব বুঝতে পারল।

'কবে?'

জয়া শান্ত দুর্বল গলায় বলল, 'তিন দিন আগে।'

পুরন্দর চুপ করে থাকে। তারপর নিচু স্বরে বলল, 'আমি তবে যাই।'

জয়া কাঁদছিল। পিতৃশোকে না কি যথার্থ বিচ্ছেদে?

কাগজপত্রে ওদের বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। তবু বৃদ্ধ শশাংকমোহন দুজনের মধ্যে সম্পর্কের একটি অদৃশ্য সূক্ষ্ম সুতো বেঁধে রেখেছিলেন। আজ সব চুকে গেছে। জয়া এইভাবে কোনোদিন কাঁদেনি।

পুরন্দর ফিরে যেতে গিয়েও পারে না। অথচ জয়ার দিকে এগিয়ে আসতেও পারছিল না। মধ্যবর্তী স্থান জুড়ে সে দাঁড়িয়েছিল।

ছবি : শোভাজিৎ

একটি দেবশিশুর জন্ম



এপ্রিলের শেষদিক থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত কলকাতার টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে একটু বিশেষ ধরনের কর্মব্যস্ততা চলছিল। বহু-পুরস্কৃত পরিচালক উৎপলেন্দু চক্রবর্তী তাঁর হিন্দি ছবি 'দেবশিশু'র অন্তিম পর্বের শুটিং করছিলেন, অভিনয় করতে এসেছিলেন বম্বের একদল সাড়া-জাগানো শিল্পী – স্মিতা পাতিল, ওম পুরী, সাধু মেহের, রোহিণী হাতংগাদি। বর্তমান প্রতিবেদক সেটে উপস্থিত হয়ে দেখলেন এই প্রবল গ্রীষ্মেও কলাকুশলী অতিথিতে ফ্লোর সরগরম। স্মিতা বা ওমের মতো শিল্পী তো প্রতিদিন টালিগঞ্জে কাজ করতে আসেন না!

ফ্লোরে একাধিক সেট, ঠাসা কর্মসূচী – উৎপলেন্দু ব্যস্ত পায়ে যাওয়া-আসা করছিলেন। এক ফাঁকে এই ছবির বিষয়ে তাঁর সঙ্গে দু-একটি প্রয়োজনীয় কথা সেরে নেওয়া গেল। 'দেবশিশু'র বিষয়বস্তু ধর্মীয় কুসংস্কার। ভারতের মতো নানা মুনির দেশে বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক হওয়ারই সম্ভাবনা। তবে 'ময়না তদন্ত' ও 'চোখ' যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন বিতর্কে উৎপলেন্দু ভীত নন। আগের দুটি ছবিতে তিনি সাহসের সঙ্গে সামাজিক অসাম্যের দুটি চিত্র উপস্থিত করেছিলেন। ধর্ম নিয়ে যারা ব্যবসা করে তাদের মুখোশ খুলে দেওয়া এ ছবির অন্যতম লক্ষ্য। অবশ্য স্যাটায়ার বা শ্লেষ হিসেবে নয়, 'দেবশিশু'কে তিনি নিছক এক মানবিক সমস্যা হিসেবে উপস্থিত করতে চেয়েছেন। ছবির প্রযোজক এন এফ ডি সি।

একদিকের সেটে ওম পুরী ও সাধু মেহেরকে নিয়ে চিত্রগ্রহণ করা হচ্ছিল। রাত্রির দৃশ্য, দোতলা গ্রাম্য কোঠাঁবাড়ি – সাধু দৌড়ে এসে বন্ধ দরজার সামনে চেঁচিয়ে ডাকবেন আর দরজা খুলে টর্চ হাতে বেরিয়ে আসবেন ওম। দৃশ্যের প্রথম অংশ একটি সংক্ষিপ্ত ট্র্যাক শটে গৃহীত হলো, কিন্তু পরবর্তী অংশের জন্য ক্যামেরাম্যান সৌমেন্দু রায়কে (ইনি এবং এঁর সহকারী পূর্ণেন্দু বসু দুই দশকেরও বেশি সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কাজ করছেন) একটু ভাবতে হলো। বোধ হয় ঘর থেকে লণ্ঠনের আলো এসে তির্যকভাবে পড়বে সাধুর মুখে এবং বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে আর একটি শটে ওমের ছায়া-শরীর দেখা যাবে খোলা দরজায়, তাই আলোক-নিয়ন্ত্রণে বেশ কিছু অদলবদল করতে হলো, ক্যামেরা কোথায় বসবে সে বিষয়ে নতুন করে নির্দেশ দিতে হলো। মেক-আপ শিল্পী অনন্ত দাস এরই মধ্যে ঘোরাঘুরি করছেন রং-তুলি নিয়ে, এই গরমে অভিনেতাদের রূপসজ্জায় যাতে কোনো হেরফের না হয়।

এত শোরগোলের মাঝখানেও কোনো কোনো শিল্পী কেমন একা হতে জানেন! ওম



'দেবশিশু'-র একটি দৃশ্যে সাধু মেহের ও স্মিতা পাতিল/ফটো : জ্যোতিষ চক্রবর্তী

আপনমনে নিজের সংলাপ মুখস্থ করছিলেন। পেডেস্টাল পাখার হাওয়া গায়ে লাগছে কি লাগছে না খেয়াল নেই, দৃশ্যের জন্য একটি হাতকাটা গেঞ্জি ও ছিটের 'কাচ্চা' তাঁর পরনে – এই পোশাকেই কার্লোভারির শ্রেষ্ঠ অভিনেতা সমস্ত দিন কাটালেন, এমনকি মধ্যাহ্ন ভোজনের আসরেও তাই। সাধু মেহের কথা বলেন কম। কলাকুশলীরা ক্যামেরার স্থান পরিবর্তন করছেন, আলো সরাচ্ছেন এক দিক থেকে আর এক দিকে, সাধু কিন্তু গম্ভীর মুখে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি – আজ শুটিং শেষ হলে তবে কামাবেন। অভিনয় সাধুর



দৃশ্য গ্রহণের আগে নায়িকা স্মিতা পাতিলের সঙ্গে আলোচনারত পরিচালক উৎপলেন্দু চক্রবর্তী

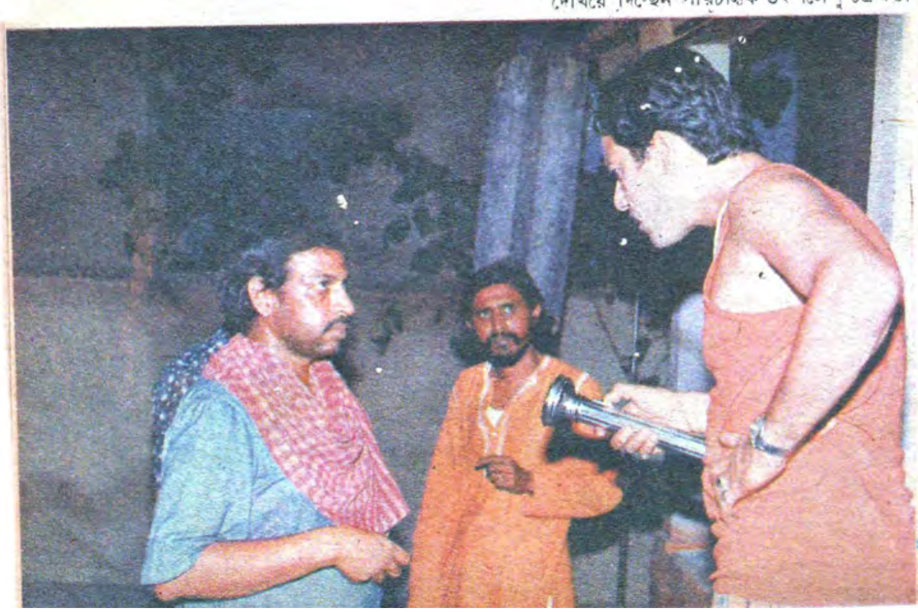


'দেবশিশু'-র একটি দৃশ্যে সাধু মেহের



স্মিতা পাতিল

একটি দৃশ্য গ্রহণের পূর্ব মুহূর্তে ওম পুরী ও সাধু মেহেরকে অভিনয়ের দৃশ্যটি দেখিয়ে দিচ্ছেন পরিচালক উৎপলেন্দু চক্রবর্তী



জীবনের মাত্র একটি দিক, অন্য দিকটির কথা কেউ কেউ জানেন। তিনি নিজে একজন চলচ্চিত্র পরিচালকও বটে, শিশুদের জন্য ছবি করেন। সম্প্রতি চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটির প্রযোজনায় 'ডুঙ্গা' নামে একটি ছবির (কাহিনীঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) কাজ শেষ করে এসেছেন। ওড়িশার ছেলে সাধু, বাংলাভালই বলেন, বাংলা ছবিতে অভিনয়ও করেছেন। ভারতে শিশু চলচ্চিত্রের প্রযোজনা ও পরিবেশন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর



'দেবশিশু'-র একটি দৃশ্যে সাধু মেহের ও স্মিতা পাতিল

গভীর ক্ষোভ রয়েছে।

এদিকে স্মিতা উপস্থিত হয়েছেন। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা এসেছেন স্টুডিওতে, পরিধানে সালোয়ার কামিজ। তাঁর কাজ অবশ্য শুরু হবে লাঞ্চ ব্রেকের পর, তাই সকলকে সম্ভাষণ জানিয়ে স্টুডিওর একপাশে নিজের ঘরে চলে গেলেন তিনি। স্মিতার দর্শনপ্রার্থী অনেকেই সকাল থেকে অপেক্ষা করছেন, বর্তমান প্রতিবেদক তাঁদের অন্যতম। প্রতিদিন রাত প্রায় আটটা পর্যন্ত একটানা কাজ করছেন স্মিতা। এ ছবিতে তিনি ও সাধু এক দেহাতী দম্পতির ভূমিকায় অভিনয় করছেন, যারা এক দুর্বল মুহূর্তে তাদের নবজাত বিকলাঙ্গ পুত্রকে পরিত্যাগ করেছিল। সে অপরাধবোধ থেকে তারা মুক্ত হতে পারেনি। একদিন নাটকীয়ভাবে সেই পরিত্যক্ত পুত্রকে তারা আবিষ্কার করে – কাহিনীর এই অংশটি আপাতত অপ্রকাশিত থাক – কিন্তু ততদিনে নিজের সন্তানের ওপর তাদের দাবি প্রায় খারিজ হয়ে গেছে।

একটি তীব্র ও অন্তরঙ্গ দৃশ্যে প্রহৃত, অপমানিত সাধু বাড়ি ফিরে আবেগাকুল স্মিতাকে এই খবরটি দেবেন। নিচু ঘর, মাটির দেওয়াল, আশেপাশে দরিদ্র গৃহস্থালির সামান্য উপকরণ। ক্যামেরা এবার প্রায় মাটিতে বসানো হলো, যাতে বসে থাকা দুই শিল্পীর মুখ ক্লোজ-আপে পাওয়া যায়। উৎপলেন্দু তাঁর সহকারী অক্ষয়ের মাধ্যমে শিল্পীদের বুঝিয়ে দিলেন এ দৃশ্যে সংলাপ কীভাবে বলতে হবে। তাঁর চিত্রনাট্যে সংলাপ এমনিতে কম, সংলাপ বলা শেষ হলে প্রায়শ তিনি ক্যামেরাকে 'হোলড' বলে নির্দেশ দিচ্ছিলেন এবং ক্যামেরা ধরে রাখছিল শিল্পীর নির্দিষ্ট মুহূর্তের অভিব্যক্তি। বস্তুত, এ ছবির গুণী শিল্পীদের বেশি বোঝাতে হচ্ছিল না, চলা-ফেরা, অভিব্যক্তি দিয়ে তাঁরা নিজেরাই দৃশ্য পরিকল্পনায় সহায়তা করছিলেন।



সারাদিনের কাজের শেষে শ্রান্ত স্মিতা কিন্তু কথা রাখলেন – বর্তমান প্রতিবেদককে একটি একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন। বম্বের সুপারস্টাররা মানুষ কেমন হন জানি না, বোধ হয় অগণিত ভক্তের পূজায় তাঁরা আর মাটির পৃথিবীতে থাকেন না, হয়ে যান কোনো গন্ধর্বলোকের বাসিন্দা। স্মিতার দুই পা কিন্তু দৃঢ়ভাবে পৃথিবীর মাটিতে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর কথাবার্তায় চিন্তাশক্তির পরিচয় স্পষ্ট। ইংরেজি বলেন অসাধারণ (একসময় বম্বে দূরদর্শনে ইংরেজি খবর পড়তেন) আর নিজের অভিনেয় চরিত্র সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখেন। এই সাক্ষাৎকারটি সুযোগমত 'সুকন্যা'র পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পেশ করা যাবে।

বিশেষ প্রতিনিধি

ফটো : অর্ধেন্দু রায়


একটু দেওয়া,
একটু নেওয়া
USHA
উষা ঘরে আনে
আশা ও ভালবাসার উপহার!
আপনার সুন্দর পরিবারে সকলকে আপন করে নিতে উষা সেলাই মেশিনের জুড়ি নেই। কারণ নামে, গুণে আর কাজে উষা মেশিনই ভারতের সেরা। তাই মনের মানুষকে মনের মত উপহার দিতে হলেই মনে আসে শুধু একটি নাম—উষা।
উষা
কেনা ভাল সবার ভাল

কর্মরতা মায়ের সন্তানদের সামাজিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া

স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। ছুটির পর হল্লা করে ছেলের দল বাড়ি ফিরছে। কেউ কেউ বাড়ির লোকের সঙ্গে, কেউ কেউ বন্ধুরা মিলে জটলা পাকিয়ে হাঁটছে। মোটকথা স্কুলশেষে সবারই বাড়ি ফেরার তাড়া। দিব্যেন্দু, শান্তনু ও অলকদের কিন্তু অত তাড়া নেই, মাঠে তখনও ফুটবল খেলছে ওরা। খেলাটা শেষ করে যাবে। এদের কেউ পাশের ফ্ল্যাট থেকে চাবি নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়বে, কারও দরজা খুলে দেবে বাড়ির কাজের লোক। তারপর জামাটামা ছেড়ে খেয়ে নিয়ে পড়তে বসার আগে কিছুক্ষণ টিভিও দেখে নেওয়া যেতে পারে। তার আগে তো মা কাজ থেকে ফিরছে না। সেন্ট জোসেফ স্কুলের ক্লাস সেভেনের সোমনাথ বা বেথুন স্কুলের চন্দ্রা তো ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি সঙ্গে করেই নিয়ে যায়। স্কুল থেকে এসে নিজেরাই ঘর খুলে ঢোকে, খাবার খেয়ে পড়তে পড়তে অপেক্ষা করতে থাকে মা কখন আসবে। ওরা কেউ বাড়ি ফিরে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে না, মায়ের কাছে খেতে খেতে স্কুলের দুষ্টুমির জন্য বকুনি খায় না। ওদের সবার মা কাজ করে। কেউ অফিসে, কেউ স্কুলে, কেউ হাসপাতালে, কেউ বা অন্য কোথাও। ওদের স্কুল থেকে ফেরার আগে মায়েরা ঘরে এসে পৌঁছতে পারে না। আচ্ছা, কী ভাবে ওরা ওদের মায়ের সম্বন্ধে? এই কৌতূহল নিয়ে জুলিয়ান ডে-র ক্লাস ওয়ানের বুবাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম – বুবাই, তুমি যখন স্কুল থেকে ফের তখন তোমার মা তো বাড়ি থাকেন না, তুমি কার কাছে খাও? কার কাছে থাক? একটা লালটুকটুকে শার্ট পরে, এক রবিবার বিকেলে মার কোলে-পিঠে বারবার ঝাঁপিয়ে পড়ছিল বুবাই। আমার কথা শুনে সরে এল –দিদির কাছে (কাজের লোক) থাকি, দিদির কাছেই খাই। মার কাছে খেতে ইচ্ছে করে না? – হুঁ, জোরে ঘাড় কাত করল ও। মার কাছে খেতে ইচ্ছে করে, মার কাছে পড়তে ইচ্ছে করে। তাহলে তো তোমার মায়ের উপর খুব রাগ না?

– কেন, মা তো কাজে যায়, কী করে খাওয়াবে? ছুটির দিন আমি সব সময় মায়ের কাছে থাকি। মা মারে না, বকে না, আমাকে পড়ায়। আমার সঙ্গে খেলে। এতগুলো কথা বলে একটু দম নিয়ে বেশ কড়া সুরে আমার দিকে তাকিয়ে বুবাই এমনভাবে বলল 'আমার মা খুব ভাল' যে

বিনতা রায়চৌধুরী

> স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকেও আজ সংসারের প্রয়োজনে কর্মজগতে প্রবেশ করতে হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তাঁদের সন্তানের দেখাশোনার ভার বর্তাচ্ছে পরিচারিকা বা পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের প্রতি। মায়ের স্নেহ যত্নের অভাব তাদের কীভাবে বড় করে তুলছে? এই অভাববোধ থেকে মায়ের প্রতি তাদের মনোভাবই বা কেমন? এরকমই কিছু জরুরি প্রশ্নের উত্তর মিলবে বর্তমান নিবন্ধে।

আমি না হেসে থাকতে পারলাম না। 'জানেন তো, আমার ছেলে আমাকে ভীষণ বোঝে। ওই ছয় বছরের শিশুটি যদি আমাকে এতটা না বুঝত তাহলে আমার কাজ করাই মুশকিল হত।' বললেন বুবাইয়ের মা, শেঠ সুরজমল জালান বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, পাইকপাড়ার বনানী ঘোষ। বললাম, কেন কর্মজীবনে এলেন? ব্যক্তিগত ইচ্ছা, না কি সাংসারিক প্রয়োজনে? একটুও ইতস্তত না করে অত্যন্ত সরল হাসিতে মুখ ভরিয়ে জবাব দিলেন – 'নিশ্চয়ই সাংসারিক প্রয়োজনে।' মনে হয় না কাজ করতে গিয়ে ছেলের অবহেলা করছি? – 'তা ঠিক মনে হয় না। কারণ আমার সব পরিশ্রম তো ওর জন্যই। তবে ফিরে এসে যদি দেখি চান করেনি, ঠিকমত খায়নি, তাহলে খুব কষ্ট হয়।' ও আপনাকে কতখানি মিস করে বলে আপনার মনে হয়? –'অনেকটাই। আমাকে ছেড়ে থাকতে ওর কষ্ট হয় বুঝি কিন্তু কখনো বায়না করে না 'কাজে যেও না' বলে। এমনকি ওর অসুখ হলেও না।' বুবাইয়ের বাবাও চাকরি করেন কিন্তু সাংসারিক দায়িত্ব ওর মার কাঁধেই। 'সংসার সামলানো কি পুরুষের কাজ বলুন? হাত পুড়িয়ে খাবে তো আমি রয়েছি কী জন্য? তবে খুব অসুবিধা হলে একটু আধটু হেল্প তো সবাই করে।' বনানী দেবীর কথাগুলো যথেষ্ট স্পষ্ট মনে হল। শতকরা নব্বইভাগ ঘরণীর মুখের কথাই তিনি বললেন।

এই ছবি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্য। তবে ব্যতিক্রমও আছে। একটি পরিবারের কথা জানি, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরি করেন। তাঁদের দুটি বাচ্চাও আছে। বাচ্চারা স্কুলে যায়। এই ভদ্রমহিলা কিন্তু রান্না করা আর চুল বাঁধার দায়িত্ব দুটোই জোয়ালের মত কাঁধে টেনে নেননি। ভদ্রলোক অত্যন্ত সহানুভূতিসম্পন্ন। দুজনেই যখন বাইরে কাজ করতে যান, তখন বাড়ির কাজটা দুজনেরই করা উচিত, ভদ্রলোক এই মতে বিশ্বাসী। তাই এই সংসারে একটা অপূর্ব আন্ডারস্ট্যান্ডিং রয়েছে যেটা প্রায় কোথাও দেখা যায় না। ভদ্রলোক সকালের রান্নার ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন আর রাত্রের রান্নার ভার রয়েছে স্ত্রীর উপর। বাচ্চার দেখাশোনা, পড়ানো, সঙ্গ দেওয়া সমানভাবে দুজনের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়া। কোনো ভুল বোঝাবুঝি নেই।

এমন সুন্দর শ্রমবণ্টন অন্য পরিবারগুলোতে নেই কেন? কেন স্ত্রীকে অফিস করেও সমানে রান্নাঘর আর অন্যান্য সাংসারিক কাজ করতে হয়? কেন বাচ্চারা অবহেলিত হয়? এর সবচেয়ে বড় কারণটি কী জানেন? এর সবচেয়ে বড় কারণ হল বহু পুরাতন একটি কথা – 'পাছে লোকে কিছু বলে'। হ্যাঁ ঠিক তাই। যে পরিবারটির কথা বললাম, ওদের কথাই বলছি। ওদের ঘরে যখন ছেলেটির বাবা-মা কিংবা মেয়েটির বাবা-মা কিছুদিনের জন্য আসেন তখন স্ত্রীকেই সংসারের সমস্ত কাজ হাতে তুলে

নিতে হয়। ভদ্রলোকের ঘরের কাজ সব বন্ধ থাকে। না হলে নাকি ওরা নিন্দে করবে – বলবে, ছিঃ ছিঃ ছেলেটি (অথবা জামাই) বাড়িতে রান্না করছে ? ঘরের কাজ করছে ! স্ত্রীটিও তেমন, স্বামীকে দিয়ে এইসব করাচ্ছে ! এটা ছেলেদের কাজ ? ইত্যাদি।

এই যে ঘুণেধরা পুরনো মানসিকতাগুলো, এগুলো তাড়াতে পারলেই কিন্তু জীবনের ছন্দ অনেক সহজ হয়ে যায়। যে পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরি করেন, সেই পরিবারে দুজনেরই বাড়ির কাজ শেয়ার করে করা উচিত। তাতে স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক চাপ কম পড়ে। তাঁরা অনেক মানবিক হয়ে উঠতে পারেন। ছেলে-মেয়েরাও অনেক সুস্থ সাবলীল পরিবেশে বাবা-মাকে সঙ্গীরূপে পেতে পারে।

বেথুন স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী বর্ণালী বসু কিন্তু একেবারেই চায় না মা চাকরি করুক। ওর ভীষণ অভিমান মাকে কাছে পায় না বলে – 'মাকে জড়িয়ে ধরতে কী ভাল যে লাগে আমার ! আমি যখন বড় হয়ে যাব তখনও ঠিক এইরকম করে মাকে জড়িয়ে ধরব।' স্কুল থেকে ফিরে বেচারা মায়ের অভাবে কাজের মেয়েটিকেই জড়িয়ে ধরে। বর্ণালীর মা মঞ্জরী বসু প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরিয়ান। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাকে কাছে না পেয়ে ওদের কেমন অনুভূতি হয় বলে মনে হয় আপনার ? হাসতে হাসতে তিনি বললেন, – 'আমার বড় মেয়ে সোনালী ছোটবেলায় কি বলত জানেন ? বলত – গাছ তো শুকিয়ে যাচ্ছে, কেউ তো যত্ন করে না। আমি তো আমার নিজের চুল সবসময় নিজে বাঁধি। তুমি কখনো বেঁধে দাও ? আমার বন্ধুদের মায়েরা বেঁধে দেয়। এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যখন দেখে বন্ধুরা মায়ের যত্ন পাচ্ছে তখন ওদের খুব মন খারাপ হয়, কিছুটা যেন ঈর্ষাও। কিন্তু এখন ক্লাস নাইনে পড়া সোনালীর মত – আমরা তো বড় হয়ে গেছি। এখন মা চাকরি ছাড়বেন কেন ? আমিই তো মাকে চাকরি ছাড়তে দেব না।' মঞ্জরী দেবীকে বললাম, আপনি কি মনে করেন গৃহবধূরা যদি কর্মজগতে প্রবেশ করে তাহলে ছেলেমেয়েদের ক্ষতি হয় ? – 'কিছুটা স্বীকার করি। কেননা, আমি বাড়ি থাকলে ওদের যেভাবে দেখতে পারি, কাজের লোকেরা সেভাবে দেখতে পারে না, এটা তো ঠিক। ওদের মানসিক ডেভেলপমেন্ট কিভাবে গড়ে উঠছে, সেটাও ওদের সঙ্গে সবসময় না মিশলে অনুভব করা যায় না। সেদিক থেকে মাঝে মাঝে নিজেই গিল্টি কনসাসে ভুগি।' সত্যিই তো, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বেরিয়ে সেই ভি



বর্ণালী ও সোনালীর সঙ্গে মঞ্জরী বসু

আই পি রোডে মঞ্জরী দেবী যখন ফেরেন তখনও বর্ণালী সোনালী তেমনভাবে মাকে পায় না। মা তখন ভীষণ টায়ার্ড। ছুটির দিনগুলো কী করেন ? ওদের সঙ্গেই কাটান তো ? – 'মোটামুটি তাই, কিন্তু কিছু সামাজিক কর্তব্যও তো আছে। সেগুলোর জন্য সময় দিতে হয়। ওরা রাগ করে। মঞ্জরী দেবীর স্বামী তরুণ বসু কিন্তু খুবই সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষ। স্ত্রী যে সময়টুকু বাড়িতে থাকে না, সে সময় যতটা সম্ভব তিনি ছেলেমেয়েদের সঙ্গ দেন, ঘরোয়া কাজেও স্ত্রীকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। এমন হয়ত হল, যেদিন ওঁর ছুটি সেদিন স্ত্রীর অফিস রয়েছে, সেদিন ঘরের বা বাচ্চাদের কোনো কাজই করতে হয় না মঞ্জরী দেবীকে। 'রান্না-টান্না অবশ্য কাজের লোকই করে। তবে যদি কোনো সময় কাজের লোক না থাকে তাহলে সব কাজের অর্ধেকই উনি করে দেন', বললেন মঞ্জরী দেবী। 'এমনকি রাতে টেবিল ও বাসন পরিষ্কার পর্যন্ত করে দেন। রান্নাটা অবশ্য আমি করি কারণ উনি রাঁধতে পারেন না, তবে সবরকম হেল্প করেন।'

তাহলে আপনি স্বামীর খুব সাহায্য পান ? অন্যান্য কর্মরতা মহিলাদের মধ্যে আপনি তো একসেপশনাল বলতে হবে।

– 'তা বলতে পারেন, স্বামীর প্রচন্ড সাহায্য না পেলে আমি চাকরি করতে করতে এম এ পড়তে পারতাম ? কখনই না। আমার মেয়ে যখন ছোট ছিল তখন ওর যাবতীয় পরিচর্যা মায়ের মত করেই ওর বাবা করেছে। আমার একদিকে চাকরি অন্যদিকে পরীক্ষা, সকালবেলা চা-টা পর্যন্ত তখন আমার সামনে এনে দিয়েছেন। ওঁর সহানুভূতির কাছে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।'

একান্নবর্তী পরিবারে বসবাসকারী কর্মজীবী মায়ের ছেলেমেয়েদের একটা দারুণ সুবিধা আছে। মা অনেকক্ষণ বাড়ি না থাকলেও ওরা নিঃসঙ্গ বোধ করে না। যেমন বাগুইহাটির রাজা মুখার্জি, মা বাড়ি না থাকার জন্য কখনও একাকিত্ব বোধ করেনি। – 'ছোটবেলা থেকেই তো দেখে আসছি মা অফিস করে। কখনও একা লাগে না। সত্যি কথা বলতে কি আমার তেমন কোনো অসুবিধাই হয় না।' রাজার কেন অসুবিধা হবে ? কাকিমা, জেঠিমা, জেঠতুতো দাদা-বউদিরা ওকে সবসময় ঘিরে আছে। এক একদিন তোমার মনে হয় না মা আজ অফিস না গেলে ভাল হত ? – 'না, সেরকম কখনও মনে হয় না। তবে যদি আকাশে খুব মেঘটেঘ হয় তখন মনে হয় মা আজ অফিস না গেলেই ভাল হয়।' নারায়ণ দাস বাঙ্গুর মেমোরিয়াল মাল্টিপারপাস স্কুলের ক্লাস টেনের ছাত্র রাজা, ওর মা গায়ত্রী মুখার্জি বি সি রায় পলিক্লিনিকের স্টাফ নার্স। রাজাকে বললাম, তোমার যখন কোনো সমস্যা আসে তখন কাকে বল ? – 'কাকিমাকে বলি, বাড়ির সবাই-ই আমাকে খুব ভালবাসে।' তোমার মায়ের সম্বন্ধে তোমার কী মনে হয় ? – 'আমার মা খুব হাসিখুশি কিন্তু খুব চাপা। মনে কোনো কষ্ট হলে বলে না, এমনকি অসুখ হলেও চেপে রাখে।' মাকে বন্ধু বলে ভাবতে পার ? হেসে ফেলল রাজা – 'না ঠিক বন্ধু বলে ভাবতে পারি না।' তাহলে কি মনে হয় মায়ের কাজের জগৎ সন্তানের সঙ্গে দূরত্বের সৃষ্টি করে ? না তাও না, কারণ মাকে রাজার সারাদিন না হলেও চলে কিন্তু রাত্রিবেলা মায়ের পাশটিতে ঘুমোনো চাই। শুধু তাই না, যত কাজই থাকুক, রাজার মা গায়ত্রী দেবী ছেলের জন্মদিনে ছুটি নেবেনই। অতএব মাতাপুত্রের স্নেহবন্ধন একটুও শিথিল নয়। রাজার বাবা নেই, তাই বাবার সাহচর্য পাওয়া থেকে ও বঞ্চিত। গায়ত্রী দেবী একান্নবর্তী পরিবারের অধিবাসিনী তাই স্বামীর অবর্তমানে ছেলেকে কোথায় রেখে যাব সে ভাবনা ভাবতে হয়না তাঁকে।

'আমার মা আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু', রাজার ঠিক উল্টো কথাটা বলল ফুটফুটে চেহারার হাসিখুশি মেয়ে সল্ট লেকের পর্ণা ভাদুড়ী। পর্ণার মা ইলা ভাদুড়ী হাওড়া অর্থপেডিক হসপিটালের লেডি হাউস ভিজিটর। পর্ণা এবার উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করল, ইচ্ছে জিওগ্রাফি নিয়ে পড়ার। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, মাকে অতক্ষণ ছেড়ে থাকতে খারাপ লাগে না ? – 'লাগে, বেশি লাগে, মা যখন ট্যুরের জন্য কলকাতার বাইরে যায়। খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগে। তাছাড়া অন্য সময়টা মানিয়ে নিই।' পর্ণা, তুমি কি মনে কর যে মার চাকরি করাটা

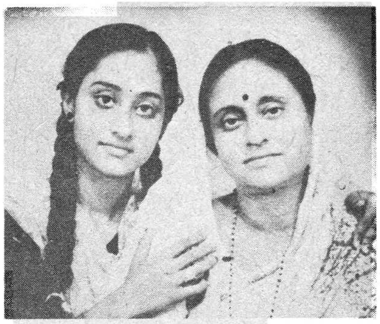
জরুরী? – 'নিশ্চয়ই, আজকের দিনে ভাল স্ট্যাণ্ডার্ড মেনটেন করতে গেলে মায়ের কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে। আমার সমস্ত শখ মেটান মা। এমনকি আমার কিছু চাইতেও হয় না। মা আমায় ভীষণ বোঝেন।' বেশ ভেবেচিন্তেই উত্তর দিচ্ছিল পর্ণা। মার কষ্ট হচ্ছে ভেবে সহানুভূতি হয় না? – 'খুব সহানুভূতি হয়। মা-র কাজটাই তো ভিজিটের, তাই পরিশ্রম আছেই। মায়ের জন্য খুব ফিল করি আমি।' পর্ণা বাবার সঙ্গও যথেষ্ট পায়। তবে মাকে পেলে যেমন মন ভরে বাবাকে দিয়ে ততটা হয় না। 'বাবাকে সংসার বা আমার দেখাশোনা কিছুই করতে হয় না। আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের স্বাবলম্বী মনে করি।' মায়ের হঠাৎ ছুটি হয়ে গেলে খুব আনন্দ পায় পর্ণা। যে-কোনো ছুটির দিনই ও খুব এনজয় করে। মা ও মেয়ের মধ্যে কোনো আড়াল ভাব নেই, দুজনের কাছেই দুজনে খুব আন্তরিক। বাবার কাজ করাটা যেমন ছেলেমেয়েরা সহজভাবে নেয়, পর্ণা মায়ের কাজ করাটাও সেরকম সহজভাবে নিয়েছে। বন্ধুদের মায়ের আদর-যত্ন দেখে বটে কিন্তু ওর মা যখন অফিস থেকে রেলের পাশ পেয়ে ওকে নিয়ে মাঝেমাঝেই বেড়াতে যান তখন তো ওর বন্ধুরাও ওকে সেরকম করে দেখে! মায়ের কর্মজীবন তোমাকে ব্যক্তিগতভাবে কোনো সুফল দিয়েছে? – "হ্যাঁ, একটা ব্যাপারে। মাকে বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় বলে ছোটবেলা থেকেই আমি খুব স্বাবলম্বী। আমার নিজের কাজ আমি নিজেই সব করে নিতে পারি। যাকে বলে সেল্ফ হেল্প।'

রাজা আর পর্ণার সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছিল সত্যিই মায়েদের কর্মজীবন ছেলেমেয়েদের মনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। বরং আকর্ষণ বোধহয় আরও গাঢ় করে তোলে বেশ কিছুটা সময়ের বিরহের অনুভবে। কিন্তু মনোহর-পুকুর রোডে গিয়ে যখন মুখোমুখি হলাম সিটি সিভিল কোর্টের অ্যাডভোকেট মঞ্জুষা পালচৌধুরীর, তখন অন্যদিকে ঘাড় ফেরাতে হল। তিনি বললেন, 'আমার মনে হয় মা যদি কাজের জন্য অনেকটা সময় বাইরে কাটায় তাহলে ছেলেমেয়েদের মায়ের উপর টান একটু কমে যায়। আমার ছেলে আমার কাছে খুব একটা ঘেঁষে না, বরং বলতে পারেন ও 'বাবাপ্রিয়' ছেলে।' মঞ্জুষা দেবী বিয়ের আগে থেকেই প্র্যাকটিস করছেন এবং বিয়ের পরও পূর্ণ উদ্যমে কাজ করে যাচ্ছেন। কাজ করেন নিজেরই উৎসাহে – প্রেরণায়, সাংসারিক প্রয়োজনে নয়। 'আমি বিশ্বাস করি শুধু সংসার নয়, মেয়েদেরও নিজস্ব কর্মজগৎ থাকা উচিত। ব্যক্তিত্বের দিক থেকে এবং মানসিক তৃপ্তির দিক থেকে এর প্রয়োজন আছে।' বললেন শ্রীমতী পালচৌধুরী।



গায়ত্রী মুখার্জি ও রাজা

আপনার মনে হয় না নিজের উচ্চাশার কাছে ছেলেকে স্যাক্রিফাইস করছেন? অকপটে উত্তর দিলেন – 'হ্যাঁ নিশ্চয়ই মনে হয়, কিছুটা তো তাই করছি। আমার মা হিসেবে যেটুকু কর্তব্য সেটা তো আমি করতে পারি না।' তাহলে কাজ থেকে সরে আসছেন



পর্ণা ও ইলা ভাদুড়ী

না কেন? সরাসরি প্রশ্ন করলাম। – 'উপায় নেই, প্রয়োজন এখন অবলিগেশন হয়ে গেছে। কত লোকের কত গুরুত্বপূর্ণ ফাইল আমার হাতে। মাঝে মাঝে মনে হয় ছেলের ক্ষতিই হচ্ছে। তবু কাজ ছাড়তে পারি না।'

আমাদের পাশেই বসে ছিল মঞ্জুষা দেবীর একমাত্র ছেলে প্রসেনজিৎ। সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ক্লাস সিক্সের ছাত্র। বারো বছর বয়সের তুলনায় বেশ লম্বা। ও মাকে মামণি বলে ডাকে আর ঠাকুমাকে মা। ছোট বয়সটা ওর ঠাকুমার কাছেই কেটেছে আর কিছুটা দিন কেটেছে হোস্টেলে।

প্রসেনজিৎকে জিজ্ঞাসা করলাম – মা বাড়ি না থাকলে কেমন লাগে? চটপট জবাব দিল, 'খেলাধুলোর খুব সুবিধে হয় আর খাওয়ার অসুবিধে হয়।'

– মার কাছে কোনো বায়না কর না?

– 'বায়না করলে মা দেবেই না, তাই বায়না করি না।'

বোঝা গেল মায়ের সঙ্গে খুব একটা জমে



মঞ্জুষা পালচৌধুরী ও প্রসেনজিৎ

না ছেলের। মঞ্জুষা দেবী কিন্তু ছেলের কথায় একটুও রাগ করলেন না। বললেন – 'ও খুব মিশুকে, সবার সঙ্গে মিশে থাকতে পারে। তাছাড়া আমার থেকে ওর বাবাই ওর বেশি বন্ধু।' প্রসেনজিতের বাবা প্রবীরবাবু ছেলেকে যথেষ্ট সঙ্গ দেন। সাংসারিক ঝক্কি অবশ্য স্বামী-স্ত্রী কাউকেই তেমন সামলাতে হয় না, কারণ তার জন্য লোক আছে। ওদের ছেলেটিকে নিয়েই যা চিন্তা।

এইসব অবস্থায় বাড়িতে লোক রেখে বা অন্য কোনো ব্যবস্থা করে কর্মজীবী বাবা ও মা দুজনেরই উচিত পরিস্থিতিটা সামলানো। মায়েরা তো সবসময় শখ করে চাকরি করতে ছোটেন না, এটা প্রয়োজনও, তাছাড়া কাজ করাটা তো উচিতই।

মার্কিন মুলুকে বেবি-সিটারের প্রচলন আছে। দারুণ সুবিধাজনক ব্যবস্থা। ওখানে মা-বাবা দুজনেই যখন বেরিয়ে যান, ছোট বাচ্চাকে দেখাশোনার জন্য রেখে যান বেবি-সিটার। পারিশ্রমিক হিসাবে ঘণ্টা পিছু ডলার গুনে দিলেই হল। এই কাজে বিশেষ করে কলেজের মেয়েরা হাসিমুখে এগিয়ে আসে। কিছু সময় কাজে লাগিয়ে ওরাও হাতখরচ তুলে নেয়, আর নিশ্চিন্ত হয় মায়েরাও।

আমাদের দেশে মহিলাদের চাকরির হার যেভাবে বাড়ছে হয়ত দেখা যাবে ওই রকম বেবি-সিটার রীতির প্রচলন হয়ে যাবে এখানেও। শিশুদের ভাল সান্নিধ্যে কেটে যাবে মায়ের অনুপস্থিতির সময়টুকু।

তবে দিন বদলাচ্ছে। মনে রাখতে হবে আজ আর শুধু সন্তানের মাকেই নয়, বাবাকেও সংসার ও ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব সমানভাবেই হাতে তুলে নিতে হবে। দুজনকেই যখন বাইরে কাজ করতে যেতে হবে তখন দুজনকেই সমান ভাগ করে নিতে হবে ঘরের কর্তব্য। তাঁরা যেন পায়ে পা মিলিয়ে কাজ করতে পারেন ঘরে-বাইরে।


নেস্টাম বেবি সিরিয়্যাল। আদর্শ, শুরু করার জন্য। বেড়ে ওঠার পক্ষে অনন্য।
নেস্টাম আর দুধ—পুষ্টির দিক থেকে এক পরিপূর্ণ খাবার।
আপনার বাচ্চার চার মাস বয়েস হলেই দুধের সংগে সংগে তার শক্ত খাবারেরও দরকার। নেস্টাম বেবি সিরিয়্যাল দিয়ে ওকে শক্ত খাবার ধরান—শিশুদের সহজে হজম করার উপযোগী করে বিশেষভাবে এটি তৈরী।
আগে থেকে ফোটানো কুসুম কুসুম দুধে নেস্টাম শুধু মিশিয়ে নিন। সংগে সংগেই পুষ্টিকারক খাবার তৈরী। শিশুকে মোটাসোটা আর প্রাণোচ্ছল করে তুলতে সাহায্য করে।
টিনের গায়ে লেখা নিয়মাবলী ঠিকমত মেনে চলুন।
নেস্টাম ও আপনার প্রস্তুত প্রণালী —শিশুর খাবারে অসংখ্য রকমারিত্ব।
আপনার বাচ্চা যেমন যেমন বড় হবে তেমনি আপনিও তাকে নানারকম স্বাদের খাবার তৈরী করে দিতে পারেন। নেস্টামের সংগে চটকানো সব্জী, সেদ্ধ করা ফল ও ডাল মিশিয়ে নতুন নতুন স্বাদের খাবার ওকে দিন। এমনি করেই ও বাড়ির সবার সংগে মিলে নানারকম খাবার খেতে শিখবে।
নেস্টাম® রাইস
আয়রণ ও ভিটামিনে ভরপূর দুধে মিশিয়ে নিন
এখন পাওয়া যাচ্ছে নতুন প্যাকে
Nestlé Nestum baby cereal
Rice
mix with milk
বিনামূল্যে!
খাবারে রকমারী স্বাদ আপনার বাচ্চাকে খুশি করবে। সুতরাং বিনামূল্যে নেস্টাম রেসিপি পুস্তিকার জন্যে নীচের ঠিকানায় লিখুন:
নেস্টাম পোস্ট বক্স নং ৬০১৬, নিউ দিল্লী ১১০০০৮
Nestlé
FSL/N/3800BN

শৈশবে কয়েকটি বোধের সঞ্চার

রাসেল বলেছেন, একজন বড় মানুষ হয়ে গড়ে উঠবার জন্য কিছু অহংকার এবং সততার দীক্ষা প্রয়োজন। এই দীক্ষা দানের দায়িত্ব অভিভাবকের। নিজের সম্বন্ধে একটি উঁচু ধারণা, একটি মহৎ অহংকার শৈশবেই সন্তানের মনে সঞ্চারিত করে দিতে হয়।

প্রসংগ এলেই অভিভাবক বলবেন, 'না, খোকন কখনও মিথ্যা কথা বলতে পারে না। বা, খুকু ওর বন্ধুর খেলনা না বলে কেন নেবে, খুকু ওরকম মেয়েই নয়। আবার খেলায় হেরে গিয়েছে, তা বলে কি খোকন মন খারাপ করতে পারে? ও জানে খেলায় হার-জিত আছেই।'

এইভাবে অহংবোধ এবং সততা-বোধ শিশুর স্বভাবগত না হওয়া পর্যন্ত অভিভাবককে সক্রিয় হয়ে এ-বোধ সঞ্চারিত করবার দায়িত্ব পালন করতে হয়। তারপর দিনে-দিনে বোধটিকে পুষ্ট করে তুলতে হবে।

সব শিশুই জন্মেছে কম-বেশি কৌতূহল নিয়ে। এই কৌতূহল অনেক সময় দার্শনিক স্তরে পৌঁছয়। যেমন ভগবান কোথায় থাকে, দেখতে কেমন অথবা এর আগে আমি কোথায় ছিলাম – এসব কথাও অনেক সময় শিশু কোনো প্রবীণকে মনের সংগী হিসেবে পেলে জিজ্ঞেস করে বসে। অনেক কৌতূহলের মধ্যে যখন শিশুর মনে এ-ধরনের কৌতূহলও আছে, তখন শৈশবেই তার মনকে কিছু উঁচু-সুরে বেঁধে দেওয়া যেতে পারে।

শিশুকে সহজেই বোঝানো যায় যে, কোনো কিছু করে যদি তার মন খারাপ হয়, যদি সে মনে ব্যথা পায়, তাহলে বুঝতে হবে, সে অন্যায় কিছু করেছে। যেমন, ভাইকে বা প্রিয় বন্ধুকে গালি দিলে বা আঘাত করলে তারা তো কষ্ট পায়ই, সে নিজেও মনে মনে কষ্ট পায়। আবার, যে-বন্ধু স্কুলে টিফিন আনেনি নিজের টিফিন থেকে তাকে ভাগ দিলে, এমনকি, নিজের পেনসিলটা সহপাঠী বা ভাইবোনকে লিখবার জন্য সাময়িক-ভাবে দিলেও সে মনে মনে একটা আনন্দের স্বাদ পায়।

শৈশবের উপলব্ধি-করা এই আনন্দ আর ব্যথার কথা মনে রেখে সারাজীবন করণীয় এবং অকরণীয় স্থির করার শিক্ষা শিশুকে শৈশবেই দেওয়া দরকার। কেননা বয়স একটু এগিয়ে গেলেই নানা স্বার্থ-চিন্তা শৈশবের পরিচ্ছন্ন সরল মনটিকে ঘোলাটে করে তোলে। শিশুর কাছে পুরাণ ইতিহাসের গল্প বলে শৈশবেই তার মনে এই ধারণা দেওয়া যায়, ন্যায়ের পথ থেকে যারা বিচ্যুত হয়েছে জীবনে তাদের মংগল হয়নি। যত শৌর্য, বীর্য, ঐশ্বর্যই থাক না কেন তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। যেমন পুরাণের রাবণ, দুর্যোধন, ইতিহাসের নেপোলিয়ন, হিটলারও ধ্বংস হয়ে গেল। আবার এদিকে রামের জয় হল, জয় হল যুধিষ্ঠিরের।

শিশুকে বোঝানো যায়, যে-প্রাণ তার ভিতরে, সেই প্রাণই পশু, পাখি, বৃক্ষ, লতা – সব কিছুর মধ্যে রয়েছে।

এই এক-প্রাণের বোধটা শিশুর মনে এলে পশু-পাখি, গাছপালার সংগে সে একটা আত্মীয়তা বোধ খুঁজে পাবে। প্রকৃতির সাহচর্য তাকে নতুনতর আনন্দ দেবে।

এইভাবে শৈশবেই শিশুর মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা বোধ দেওয়া যায় এবং দেওয়ার দরকার। ঈশ্বর জগতের পিতা, তিনি জগতের সব কিছু লালনপালন ও শাসন করছেন। আমাদের জীবনকেও সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে তিনি পরিচালিত করছেন। তিনি আমাদের সুখদুঃখ যা দিচ্ছেন তা আমাদের ভালর জন্য। কারণ তিনি পিতা, আমরা সন্তান। এই ঈশ্বরের উপর ভক্তি, নির্ভরতা, ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রীতির সম্পর্ক শিশুচিত্তে সঞ্চারিত করে দিলে তার জীবনের লড়াইকে সে অনেক সহজভাবে নিতে পারবে। সৌভাগ্য গর্ব এবং দুঃখে মুহ্যমানতা থেকে সে সহজে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।

শৈশবে মনটি যখন নরম মাটির মতো থাকে তখন সব ব্যাপারে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের মনোভাব – ঈশ্বরনির্ভরতা, মনের মধ্যে সহজে বাসা বাঁধতে পারে। আমাদের জীবনে যুক্তিহীন নানা অন্ধবিশ্বাস, সংস্কার যেভাবে অগোচরে মনের মধ্যে ঢুকে স্থায়ী বাসা বাঁধে, ঈশ্বরে বিশ্বাস, ঈশ্বর নির্ভরতাও তেমনি অজ্ঞাতসারে শিশুর মনে স্থায়ী বাসা বাঁধে।

বুদ্ধ পালি ভাষায়, রামকৃষ্ণ একেবারে গ্রাম্য ভাষায় ধর্মকথা বলেছেন। এ-সব বাদ দিয়েও চোখের সামনে শান্তিনিকেতনে পূজা-পর্যায়ের সংগীত দিয়ে প্রার্থনা হচ্ছে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের 'পিতা নোহসি' প্রার্থনাকে ভিত্তি করে 'তুমি আমাদের পিতা, তোমায় পিতা বলে যেন জানি, তোমায় পিতা বলে যেন মানি। তুমি কোরো না কোরো না রোষ' ইত্যাদি সহজ মাতৃভাষায় প্রার্থনার গান রচনা করলেন, শুধু বক্তব্যটুকু সহজ ভাষায় প্রার্থনারত ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্তে পৌঁছে দেবার জন্য। আমরা স্কুলের প্রার্থনা, পূজা অর্চনার মন্ত্র আজও আমাদের অবোধ্য, দুর্বোধ্য সংস্কৃতে ধরে রেখেছি। ফলে ঈশ্বর হৃদয়ের বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকছেন, তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ আর ঘটছে না।

বাড়িতে গুরুজনরা তাঁদের আচার-আচরণ ও জীবনচর্যা দিয়ে এবং মহাপুরুষ-জীবন ও ইতিহাসের কাহিনী নিয়ে সার্থকভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভরতা শিশুচিত্তে সঞ্চার করে দিতে পারেন।

মহাপুরুষদের জীবন এবং জীবনের নানা ঘটনা শিশুর কাছে গল্পের ছলে বলে তাকে বোঝানো যায় যে, আমাদের সকল প্রচেষ্টার উপরে আছে ঈশ্বরের অভিপ্রায়। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া একটি ঘাসের শিষও নড়ে না, গাছের একটি পাতাও নড়ে না। কপিলাবস্তুর শাক্যসিংহ রাজার ঘরে জন্মালেন, তাঁর রাজ্য ছিল, স্ত্রী ছিল, পুত্র ছিল – কিন্তু সব ত্যাগ করে তিনি মানবকল্যাণের জন্য সন্ন্যাসী হলেন, বুদ্ধ হলেন।

সম্রাট অশোক ভয়ংকর নিষ্ঠুর ছিলেন। তাঁকে 'চণ্ডাশোক' বলা হত। তিনি কলিংগ যুদ্ধের পর 'ধর্মাশোক' হলেন।

গান্ধীজী বিলেতে গিয়ে হাঁটা-চলা, কথা বলা, বেশভূষা আদবকায়দা সব কিছুতে সাহেবিয়ানা রপ্ত করে ব্যারিস্টারি পাশ করে ব্যারিস্টারি শুরু করলেন। তাঁকে শেষ পর্যন্ত দরিদ্র ভারতীয় কৃষকের দীনবেশ – পায়ে চপ্পল, হাঁটুর ওপরে এক টুকরো খদ্দর লাগিয়ে জাতির জনক হতে হল। মহাত্মা হতে হল, বিশ্ববাসীর পূজনীয় মহামানব হতে হল। এইভাবে ঈশ্বর সকলকে পরিচালিত করছেন

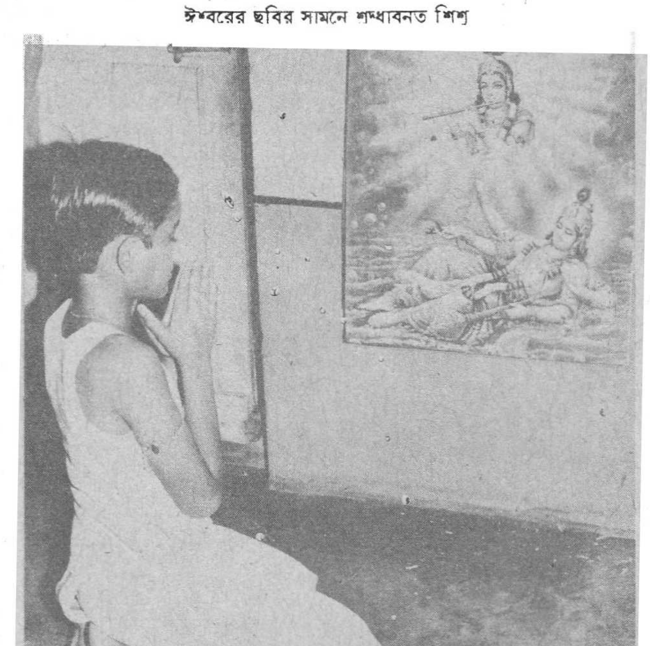
ঈশ্বরে বিশ্বাস কাউকে রাজা-উজির করে দেয় না। কিন্তু চরিত্রের মূল উপাদান হিসাবে এই বিশ্বাস ব্যক্তির আচার-আচরণে ব্যক্তিত্বে একটা শ্রী ও মসৃণতা এনে দেয়। এই বিশ্বাসের একটা অপূর্ব humanising influence আছে।

ঈশ্বরকে আমাদের চাই পরম বন্ধু হিসেবে। কারণ দুঃখ-ব্যথার দিনে তাঁর কাছেই তো প্রাণ খুলে চোখের জল ফেলা যায়, সুখের দিনে তাঁকেই তো খোলা মনে ধন্যবাদ দেওয়া যায়। তাঁর কাছে কিছুই লুকোনো বা গোপন নেই। তাই তাঁর কাছে কোনো লজ্জাও নেই। জীবনে বন্ধু হিসেবে মনের মধ্যে ঈশ্বর থাকলে, দুঃখে একান্তভাবে আমরা ভেঙে পড়ি না। সুখ সম্পদের দিনেও শান্ত, ভদ্র থাকি, ঈশপের গল্পের ব্যাঙের মতো অহংকারে ফেটে পড়ি না। এমন বন্ধুর সংগে বন্ধুত্ব পাতানোর বয়স হচ্ছে শৈশব।

ডক্টর সুখময় সেনগুপ্ত

[পরবর্তী সংখ্যায় 'জীবন প্রস্তুতির দুটি হাতিয়ার']

ঈশ্বরের ছবির সামনে শ্রদ্ধাবনত শিশু



ফটো : গৌতম রায়



ডলি রায়

আপনি যখন প্রত্যেকবার চায়ের কাপ মুখে তোলেন তখন কি একবারও আপনার মনে কোন প্রশ্ন জাগে, কারা এই চা-পাতার স্বাদ পরীক্ষা করে তার গুণাগুণ নির্ণয় করেন? আপনি কি জানেন, সেই গুণমান অনুসারেই চা-পাতার দাম নির্ধারণ করা হয়?

'কনটেমপোরারি টি কোম্পানীর' একজন সিনিয়র একজিকিউটিভ শ্রীমতী ডলি রায় হলেন সেই রকম পেশায় নিযুক্ত যাঁর কাজ হল চায়ের স্বাদ পরীক্ষা করা (ইংরিজিতে যাঁদের Tea-Taster বলা হয়) এবং তাঁদের ক্লায়েন্টদের চা-পাতাকে বাজারে বিক্রির জন্যে নীলাম ডাকার ব্যবস্থা করা।

ছোটবেলা থেকে ডলি তাঁর বাবা ডাঃ বসন্ত তাওয়াদে এবং মা ডাঃ উর্মিলা তাওয়াদের কাছ থেকে স্বাবলম্বী হবার জন্যে নিরবচ্ছিন্ন অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। বিশেষত মা সবসময়েই ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দিতেন যাতে তারা ভালভাবে লেখাপড়া শিখে এই কঠিন ধরার মাটিতে নিজের পা রাখার জন্যে একটু জায়গা করে নিতে পারে। ডলির মা উর্মিলাদেবী সেকালে সমাজ ও সংসারে যথেষ্ট লড়াই করে নিজেকে তাঁর কর্মজগতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মায়ের সেই সংগ্রামী অনুধ্যানই ডলিকে বাস্তবের রূঢ় পরিমন্ডলে এগিয়ে যেতে মনোবল যুগিয়েছে।

দারজিলিং লোরেটো কনভেন্টে স্কুলের পড়া শেষ হলে ডলি দিল্লির সাউথ এক্সটেনশন পলিটেকনিক থেকে কলেজের পাঠ সাঙ্গ করেন। এর পরে অ্যাপ্লায়েড নিউট্রিশনে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ডিপ্লোমা গ্রহণ করেন। তারপরই শুরু হল কর্মজীবন। প্রথমে ডলি 'টি বোর্ড অফ ইন্ডিয়াতে' যোগদান করেন। সেখানে তাঁর কাজকর্ম দেখে 'টি বোর্ড' অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে ভারতীয় চা শিল্পের মানোন্নয়নের জন্যে তাঁকে বেলজিয়াম পাঠান। বেলজিয়াম থেকে তিনি পুরো পশ্চিম ইওরোপ এবং আমেরিকায় সব মিলিয়ে পাঁচ বছর প্রবাসজীবন অতিবাহিত করেন। বিদেশে থাকাকালীন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভারতীয় মেয়েরা ইওরোপ, আমেরিকার মেয়েদের তুলনায় কোন অংশে হীন নয় বরং তাদের থেকে শান্ত, সহনশীল এবং বিচারবুদ্ধিতে অনেক বেশি পরিণত। ভারতীয় মেয়েদের পিছিয়ে থাকার কারণ হিসেবে তার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে নারীদের যথোপযুক্ত শিক্ষার অভাব। নারী-জাগরণ হলে আমাদের ভারতীয় সমাজ বিশ্বের সব থেকে উন্নত এবং সুসংহত সমাজ হতে পারে।

মারাঠি মেয়ে ডলি ব্যক্তিগত জীবনে সুপরিচিত কংগ্রেস নেতা সৌগত রায়ের স্ত্রী। পারিবারিক সূত্রে মারাঠি হলেও তাঁর জন্ম কলকাতাতেই। তাঁর বাবা বিগত চল্লিশ বছর যাবৎ কলকাতায় বসবাস করছেন। যার ফলে ডলি বাঙালি সমাজ সংস্কৃতি, অভিরুচি, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কার সব কিছুর সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত। আর এই সুবাদে একটি বাঙালি পরিবারে বধূ হয়ে এসেও কোনরকম অসুবিধা তিনি ভোগ করেননি। বরং অনুভব করেছেন ভারতীয় সমাজের প্রত্যেক জাতির অন্তঃস্থলে মূলত একই অনুভাবনা, একই সুর অনুরণিত হচ্ছে। সবার চিন্তাধারার মধ্যেই কোথাও যেন একটা মিল রয়েছে। বৈচিত্র্যের মাঝে একতার মূল স্পন্দনটিকে তিনি গভীরভাবে অনুভব করেন। একটি শিক্ষিত প্রগতিশীল মারাঠি পরিবারের সঙ্গে অনুরূপ একটি বাঙালি পরিবারের মধ্যে তিনি কোনরকম বৈষম্য খুঁজে পান না। তাঁর মনে হয় কিছু কিছু অবশ্য পালনীয় আচার আচরণ রীতি-নীতি আছে যা সব জাতিই অনুসরণ করে।

স্বামী রাজনীতি করলেও তিনি রাজনীতিতে মোটেই আগ্রহী নন। কারণ তিনি মনে করেন রাজনীতিও একটি প্রফেশন। প্রফেশন কথাটি এখানে তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছেন ইনভলভমেন্ট এবং ইনটেগ্রিটি অর্থে। অর্থাৎ কোন বিষয়ে আন্তরিকতা এবং দক্ষতা না থাকলে যে কোন প্রচেষ্টাই অন্তঃসারশূন্য নিস্ফল অভিনয়ে পরিণত হয়। যেহেতু রাজনীতিতে তাঁর নিজের আগ্রহ নেই সেহেতু সে-ব্যাপারে স্বামীকে সাহায্য করার নামে তাঁকে বিব্রত করতে ডলি কখনই চান না। তবে স্বামীর কর্মজগত ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে সব সময়েই তিনি সহযোগিতা করেন।

ঘরে বাইরে সর্বত্র ডলি নিজেকে পুরুষের প্রতিযোগী মনে করেন। তবে এ কারণে তিনি কখনই হীন রেষারেষির পর্যায়ে নিজেকে উপস্থাপন করেন না। তিনি প্রতিযোগী মনোভাব নিয়ে কর্মজগতে নিজের যোগ্যতা, দক্ষতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। ডলি যখন প্রথম এই ইনডাস্ট্রিতে আসেন তখন তাঁর জগতে মহিলা সহযোগী ছিল না বললেই চলে। স্বভাবতই তার সহকর্মীদের মনে হয়ত তাঁর কর্মক্ষমতা সম্পর্কে কিছু সংশয় ছিল। কিন্তু তিনি ক্রমে যোগ্যতা প্রমাণ করে নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরশীল করে তুলেছেন। তাঁর পুরুষ সহকর্মী যখন দশঘন্টা কাজ করেছেন তিনি সেই একই পরিস্থিতিতে বার ঘন্টা কাজ করেছেন। এইভাবেই তাঁর নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার প্রমাণ দেখিয়েছেন।

ডলি অবসর কাটান বই পড়ে, বাগান পরিচর্যা করে, গান শুনে। লরেন্স ডারওয়েল, জর্জ অরওয়েল, সল বেলো, সলঝেনিৎসিন প্রমুখের লেখা পড়তে তাঁর ভাল লাগে। পছন্দ করেন মেহদি হাসানের গজল শুনতে। সুনীল দাশ, মকবুল ফিদা হুসেনের শিল্প সৃকৃতি তাঁর মনকে আবিষ্ট করে। এবং রান্না করতে অবশ্যই ভাল বাসেন। নিজের হাতে রান্না করে প্রিয় পরিজনের মন ভরাবার মত আনন্দ তিনি আর কিছুতেই খুঁজে পান না। তাঁর বাড়ির সর্বত্রই ডলির সুরুচিশোভন গৃহসজ্জার ছাপ স্পষ্ট।

আমাদের ভারতীয় সমাজের মহিলারা এখনও যথার্থ স্বাধীন ও আধুনিক হয়ে উঠেছেন বলে ডলি মনে করেন না। তাঁর মতে একটি মেয়ে আধুনিক পোশাক পরিচ্ছদ—যেমন প্যান্ট শার্ট পরলেই অনেকে তাকে আধুনিক নারী হিসেবে চিহ্নিত করবে। কিন্তু সেই মেয়েটি হয়ত মানসিকভাবে খুবই কুসংস্কারাচ্ছন্ন। বাইরের পোশাকে আধুনিক হলেও সে যথার্থ আধুনিক মোটেও নয়। আধুনিক ধ্যান ধারণার সঙ্গে পরিচিতি এবং মানসিকতার দিক থেকে সংস্কারহীন না হলে কখনই তাকে আধুনিক বলা যাবে না। আর স্বাধীনতার সংজ্ঞা একেক জনের কাছে একেক রকম। স্বাধীনতারও একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে। স্বাধীনতা ভোগ করার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়। সংসার করতে এসে যৌথ দায়িত্ব যৌথ সহযোগিতা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার কথা অস্বীকার করতে পারা যায় না। সুতরাং উগ্র স্বাধীনতাকামী হলে সংসার জীবনে জটিলতা দেখা দেবেই। একটি সংসারকে সুন্দর, সুস্থ এবং সুখী করার প্রধান দায়িত্বই এসে পড়ে নারীর ভূমিকার উপর। অতএব নারীকে যথোপযুক্তভাবে বিকশিত এবং সুস্থ, স্বাবলীল মনের অধিকারী হতে হবে। তার জন্যে চাই শিক্ষার ব্যাপক প্রসার।

রীতা গুহঠাকুরতা


যে টিপের বাহারে সবাই বলে আহা রে!
শিল্পা
স্টিকার টিপ
★ আমদানি করা ম্যাট ফিনিশের ভেলভেটের মত মসৃণ বাহার কুমকুম টিপের মতই চমৎকার
★ ছিমছাম সুন্দর কাটা
★ আর লাগানো যায় যত খুশি বার
★ দর্শনীয় প্যাক এতই সুন্দর সবারই মনোহর
★ টিপ্‌স অ্যান্ড টোজ কসমেটিক্‌স দ্বারা তৈরী করা, যাদের ওপর আপনাদের অগাধ আস্থা
★ আপনার সৌন্দর্য বাড়ায় নানান রঙ ছটায়
ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষিত, ত্বকের জন্যে নিরাপদ গঁদ যুক্ত
Shilpa
STICKER BINDI

শ্রাবন্তীর কলম

আড্ডা

আড্ডার সঠিক আভিধানিক অর্থ কী, কোনদিন খুঁজে দেখিনি। এর সমার্থ-সূচক আর কী কী শব্দ আছে, তাও জানি না। জানার উৎসাহও বোধ করিনি। কেন না, আমার মনে হয়, সৌন্দর্য, ভালবাসা এমন বেশ কিছু জিনিস নিয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবন কাটে যার কোনো সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করা খুবই শক্ত, সেগুলো অনুভবের ব্যাপার। আড্ডাও তাই। আড্ডা বস্তুটি কী তার সঠিক সংজ্ঞা কজন দিতে পারবেন? কিন্তু আমরা সবাই জানি, আড্ডা কী!

চেহারার দিক দিয়ে আড্ডার সংগে বৈঠক বা মজলিসের বেশ কিছুটা মিল আছে। কিন্তু চরিত্রে?

বৈঠকের চেহারা ঢিলেঢালা হলেও একটা আলোচ্য বিষয় থাকে। সেই বিষয়ের ওপর মত বিনিময় এবং সম্ভব হলে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনোরও একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে আমাদের। স্বভাবতই বৈঠকে আমরা তাই অনেক সতর্ক। অন্যের মতামত খন্ডনে এবং স্বমত প্রতিষ্ঠায় যুক্তির হাতিয়ার নিয়ে সজাগ।

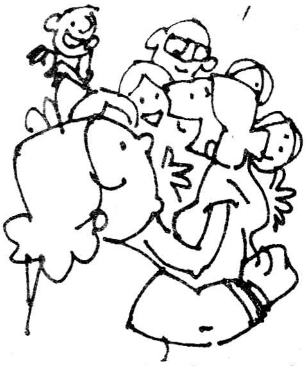
মজলিসের সংগেও কোথায় যেন একটা নান্দনিক ছন্দের যোগ আছে। ব্যাপারটা সেখানেও তাই মাপা। আনন্দ-উচ্ছ্বাস একটা অদৃশ্য সীমারেখায় বাঁধা।

কিন্তু আড্ডা? আড্ডার কোনো নির্দিষ্ট বিষয়সূচী নেই। মতামত প্রকাশের কোনো দায়দায়িত্ব নেই; কোনো নান্দনিক মাপকাঠি নেই, স্থান-কাল-পাত্রর বাছবিচার নেই। গোটা ব্যাপারটাই যেন সীমাহীন। আড্ডার তাৎক্ষণিক স্থানটি সীমাবদ্ধ হলেও চরিত্রটি যেন – সীমার মধ্যে অসীম। (পাড়ার অমুক মেয়েটির চালচলন, অমুক বাবুর ভাঁট থেকে রাজনীতি, ক্রীড়া, চলচ্চিত্র, সরকারের সাফল্য-অসাফল্য, আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী সবই এর বিষয়ীভূত)।

কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, এহেন একটি উদার, দরাজ, সঞ্জীবনী বস্তুর স্বাদ থেকে পৃথিবীর অনেক দেশই বঞ্চিত। শুধু পৃথিবী কেন, আমাদের ভারতবর্ষের কটি প্রদেশই বা আড্ডার যথার্থ স্বাদের সংগে পরিচিত? আড্ডার অবিকৃত, নির্ভেজাল আদি ঐতিহ্যটুকু বোধহয় একমাত্র আমরা বাঙালিরাই আজ পর্যন্ত বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছি। (ও-বাংলাকে হিসেবে রেখেই একথা বলছি)।

এ যুগটাই যন্ত্রযুগ, রুদ্ধশ্বাস গতির যুগ, তীব্র টেনশনের যুগ। যেখানে বিশ্রামেরই অবকাশ নেই, সেখানে কী করে মানুষ নিরুদ্বেগ আড্ডায় শামিল হতে পারে, সময়ের অপচয় করতে পারে – সেকথা ভেবে অনেকেই অবাক হয়, জানি। কিন্তু আমরা বাঙালিরা কি করে যেন এরই ফাঁকে অদম্য উৎসাহ,আড্ডার সেই ঐতিহ্যটি আজো জিইয়ে রেখেছি।

এ কি আমরা অলস বলে, না প্রাণপ্রাচুর্যে আজো অদম্য বলে, কে জানে? এ নিয়ে প্রয়োজন হলে গবেষকরা গবেষণা করুন, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যে পর্যন্ত আড্ডা জীবিত আছে, সে পর্যন্ত এ নিয়ে গবেষণার কোনো উৎসাহ নেই আমার। তার চেয়ে বরং আড্ডায়



অংশ নেওয়াতেই আমি অনেক বেশি উৎসাহী।

আড্ডার স্পৃহা বোধহয় বাঙালির মজ্জাগত, এর প্রাচীনত্বের প্রমাণ বহন করছে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ। স্রেফ আড্ডার জন্য একটা স্টাকচার বানিয়ে ফেলা – অন্য দেশের লোক একথা ভাবতেই পারে না। কিন্তু সেই ঐতিহ্যের ধারাতেই আজও লক্ষ্য করে দেখবেন, স্রেফ আড্ডা মারার জনাই কত জায়গায় পাড়ার ছেলেরা বাঁশের মাচা তৈরি করে নিয়েছে। কিন্তু যারা তৈরি করেছে সেটা তাদের এজমালি সম্পত্তি নয়। তারা যখন অন্যত্র ব্যস্ত বা অনুপস্থিত তখন সেখানে অন্য যে কোনো দল নির্লিপ্তভাবে বসে আড্ডা মেরে যাচ্ছে – কখনো বালক, কখনো বা বৃদ্ধরা। এ যেন আড্ডার দানসত্র।

আমাদের বাঙালিদের আড্ডার নির্দিষ্ট সময় বলে কিছু নেই। যে যখন যেখানে সুযোগ পাচ্ছে একটু আড্ডা মেরে যাচ্ছে। সারাদিনের ভেতর সুযোগ বুঝে যে কোনো সময় একবার মন্দিরে এসে ঠাকুর প্রণাম করে যাবার মত আর কি!

তাই, যারা চাকরি করে তারা স্নান করতে যাবার আগে পর্যন্ত কোনখানে একটু আড্ডা ছুঁয়ে যায়। টিউশনি-টিনি না থাকলে আবার সন্ধ্যার পর একটু।

যারা চাকরি করে না তারা শ্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রায় অহোরাত্র আড্ডা মারছে।

ছাত্রদের আড্ডা অধিকাংশ সময় বিকেলের দিকে। খেলার মাঠে, ক্লাবে, নদীর ধারে, নির্জন রেল লাইনের ওপর বা কোনো বন্ধুর বাড়ি।

প্রৌঢ়দের আড্ডা সাধারণত সন্ধ্যার পর। পাড়ার রকে বা নির্দিষ্ট কোনো বন্ধুর বাড়িতে।

বৃদ্ধদের আড্ডা বিকেলের দিকে পার্কে বা বিকেলের পর মন্দিরে।

বিবাহিত মহিলাদের আড্ডার ফার্স্ট পার্ট ছেলেমেয়েরা স্কুলে এবং স্বামীরা অফিসে বেরিয়ে যাবার পর। সেকেন্ড পার্ট দিবানিদ্রা সেরে শাবক ও স্বামীরা গৃহে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে।

গোটা জাতটাই আমরা নিজেদের প্যাটার্ন অনুযায়ী অহোরাত্র ম্যারাথন রেসের মত আড্ডা মেরে যাচ্ছি। কিন্তু কারো সংগে কারো সংঘর্ষ ঘটছে না। এরই ফাঁকে যাদের পড়ার তারা পড়ছে, যারা চাকরি করে তারা চাকরি করছে, মহিলারা ঘরসংসার করছে, লেখক লিখছে, গায়ক গাইছে – জীবনস্রোত যেমন বইবার বয়ে যাচ্ছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে না? অথচ এটাই আমাদের জাতীয় জীবনের বহমান সত্য।

জাতীয় কর্তব্যবোধ থেকে নয়, ব্যক্তিগতভাবে আমি আড্ডায়



উৎসাহী অনেকগুলো কারণে। সংসারের গ্লানি, জীবিকার ক্লান্তির মাঝে আড্ডা যেন (সর্বসময় বক বক করে গেলেও) বিরাট একটা অবসর। কাজের ফাঁকে এক রাউন্ড আড্ডা মেরে গেলেও যেন নতুন উৎসাহ নিয়ে আবার কাজে ফিরে বসা যায়।

আমাদের বর্তমান রুদ্ধশ্বাস জীবনে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনোর সুযোগ খুব কম লোকেরই হাতে থাকে। কিন্তু সেরকম ভাল কোনো আড্ডায় বসলে বিনা আয়েসেই অনেক কিছু জানা যায়। নিজের চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণাগুলোকে অন্যের মতামতের কষ্টিপাথরে ঘষে নিয়ে তার কতটা খাঁটি, কতটা খাদ – জেনে নেবার সুযোগ পাওয়া যায়।

সব সময়েই তো এমন উচ্চমার্গের আড্ডার সুযোগ থাকে না, পরচর্চার মুখরোচক আড্ডাতেও অনেক সময় জড়িয়ে পড়তে হয় আমাদের। কিন্তু



সেরকম আড্ডা থেকেও পরোক্ষ একটা উপকার হয় আমার। মনের অনেক জমে থাকা ক্লেদ, ক্ষোভ, রাগ, বিরক্তি চার্জ আউট করে দিয়ে নিজেকে বেশ হালকা মনে হয়। অবশ্য ব্যক্তিগতভাব যাঁরা আমাকে চেনেন, তাঁরা ভাবতে পারেন, এসব লেখার জন্যই লেখা। সকাল আটটা থেকে রাত নটা দশটা পর্যন্ত জীবিকার সূত্রে যার একটি সীমাবদ্ধ ঘরেই কাটাতে হয়, সে এমন অনায়াস, অনাবিল আড্ডার সুযোগ পায় কখন?

কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি পাই। এবং পাই বলেই এখনো এমন সজীব, কর্মক্ষম আছি।

কী করে পাই? আমার জীবিকার সূত্রেই। কাজের সূত্রেই (কখনো বিনা কাজেও) আমার কাছে বহু অভিনেতা, অভিনেত্রী, গায়ক, লেখক, বিজ্ঞাপন জগতের কর্মী, ডাক্তার, কবিরাজ এবং আরো অনেক ধরনের লোকজন আসেন। এবং স্বভাবে আমি নিজে আড্ডাবাজ বলে তাঁদের কাজ সেরেই চলে যেতে দিই না আমি। আমাদের এখানে চা-কফির ঢালাও ব্যবস্থা থাকায় সেই টোপ ফেলে তাঁদের বসাই। তারপর আড্ডার জালে জড়িয়ে ফেলি। আর আড্ডা একবার জমিয়ে দিতে পারলে, আড্ডার ঘড়িতে একবার চাবি দিয়ে দিতে পারলে, আমি জানি আড্ডা তার নিজের ধর্মেই গড়িয়ে চলে। তেমন জরুরী কোনো কাজ থাকলে সেই বহমান আড্ডা থেকে টুক করে কেটে পড়ে, কাজটুকু সেরে আবার ফিরে এসে আড্ডায় বসি!

তাই আড্ডা প্রসংগে আমার শেষ কথা – এই রুদ্ধশ্বাস টেনশনের যুগেও যদি সজীব থাকতে চান, তাহলে আড্ডা মারুন। প্রাণ খুলে আড্ডা মারুন। আমরণ আড্ডা মারুন। মনে রাখবেন, আমরা কেউ জানি না, মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়েও (যদি যান) আড্ডা মারার সুযোগ পাওয়া যায় কিনা!

শ্রাবন্তী মজুমদার

ছবি : প্রতিভূষণ মালিক



রামানুজ দাশগুপ্ত

আধুনিক বাংলা গান

আমার জীবনই আমার গান
শব্দে সাজানো ছন্দে বাজানো
দুঃখ সুখের গীতবিতান ॥

আমার কবিতা কবিতা নয়
আমার কবিতা অশ্রুঝরানো
ব্যর্থ-প্রাণের ছবি তা হয়
কান্না হাসির সুরের দোলায়
দুলেছে আমার স্বরবিতান ॥

আমার এ গান নয়তো সুরের খেয়া
আমার এ গান কান্না হাসির
জীবন থেকে নেয়া ।

আমার কবিতা বোশেখী ঝড়
আমার কবিতা প্রতিবাদে ভরা
বঞ্চিতদের কণ্ঠস্বর
চোখের জলের-পান্না চুনি
বুকভরা ব্যথা অভিমান ॥

রচনা ঃ শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় • সুর ঃ রামানুজ দাশগুপ্ত • স্বরলিপি ঃ দেবাশিস দাশগুপ্ত

		ধ			
‖ স গ প	নর্স নপ —	প মগ র	প — —	প হ্ম ম	রগর স ন্ ‖
আ মা র	জী বন ই	আ মা র	গা ০ ন	শ ০ ব্দে	সা জা নো
ন্ন্ ন্র গম	হ্মপ ম র	র হ্ম ধ	ন র্স নধ	ধন ধনধ প	ম গ — ‖
ছ ন দে	বা জা নো	দু ঃ খ	সু খে র	গী ত বি	তা ০ ন
	র্গ				
র্স র্গ র্র	র্ম র্গ র্র	র্স র্স ন	ণ — —	ম ণ ণ	ণ ণ ণ
আ মা র	ক বি তা	ক বি তা	ন ০ য়	আ মা র	ক বি তা
প ধন র্স	ধন ধপ প	গ — ম	গম ণ ধ	পধ প প	প — —
অ ০ শ্রু	ঝ রা নো	ব্য ০ র্থ	প্রা ণে র	ছ বি তা	হ ০ য়
স প হ্মপ	গ ম গ	স প হ্মপ	গম র —	র হ্ম ধ	ন র্স নধ
কা ০ ন্না	হা সি র	সু রে র	দো লা য়	দু লে ছে	আ মা র
ধন ধনধ প	ম গ — ‖				
স্ব র বি	তা ০ ন				
‖ স ম ম	ম ম —	ম ম ম	ম গ মহ্ম	ম গ —	— — —
আ মা র	এ গা ন	ন য় তো	সু রে র	খে য়া ০	০ ০ ০
গ প প	ধন ধন ধপ	প ধ পহ্ম	হ্ম প গ	গ গ গ	গ গম ধপ
আ মা র	এ গা ন	কা ০ ন্না	হা সি র	জী ব ন	থে কে ০
ম গ —	— — —				
নে য়া ০	০ ০ ০				
র্স র্গ র্র	র্ম র্গ র্গর্র	র্স ন ন	ণ — —	ম ণ —	ণ ণ ণ
আ মা র	ক বি তা	বো শে খী	ঝ ০ ড়	আ মা র	ক বি তা
প ধন নর্স	ধন ধপ প	গ — ম	গম ণ ধ	পধ প প	প — —
প্র তি বা	দে ভ রা	ব ০ ঞ্চি	ত দে র	ক ণ ঠ	স্ব ০ র
স প হ্ম	গ ম গ	স প হ্মপ	গম র —	র হ্ম ধ	ন র্স নধ
চো খে র	জ লে র	পা ০ ন্না	চু নি ০	বু ক ভ	রা ব্য থা
প — ম	গ — —				
অ ০ ভি	মা ০ ন				

ফটো : সুবীর চট্টোপাধ্যায়



'কলকাতাকে সুন্দর করবই'

শানু লাহিড়ী

শিল্পের জগতে চিত্রশিল্পী শানু লাহিড়ী একটি উজ্জ্বল নাম। শুধু ছবি নয়, ছবির মতো কলকাতা গড়ে তোলার মহান দায়িত্ব মাথায় নিয়ে, নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন শহর কলকাতাকে স্বর্গের মতো সুন্দর করে গড়ে তুলতে। বর্তমান সাক্ষাৎকারে এ ব্যাপারে তাঁর নিষ্ঠা, চিন্তাভাবনা ও সদিচ্ছার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে।

শিল্পী শানু লাহিড়ী সেই বিখ্যাত মজুমদারবাড়ির মেয়ে, যে বাড়ি পারিবারিক শৈল্পিক ঐতিহ্যে সমান নিশ্চয় নয়—কিন্তু আমাদের কাছে উপকথাসম সেই বিখ্যাত ঠাকুরবাড়ির বড় কাছাকাছি। ওঁর বড় দাদা কমলকুমার মজুমদার লেখক এবং চিত্রশিল্পী। কমলকুমারের সাহিত্য এক বিশেষ জাতের, বুঝিবা শিল্পকলা। আজকের প্রতিষ্ঠিত অনেক সাহিত্যিকই স্বীকার করবেন, সাহিত্যকর্মে তাঁরা কোথাও-না-কোথাও কমলকুমারের কাছে ঋণী। অঙ্কনের জগতে শানুর মেজদাদা নীরদ মজুমদার এক অদ্বিতীয় শিল্পী। লক্ষণীয়, পারিবারিক ঐতিহ্যের মূলগত ঐক্যে সম্পৃক্ত থেকেও শিল্পশৈলীর ক্ষেত্রে এঁরা তিনজনেই কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক। প্রতিভার প্রবল প্রকাশে এঁরা নিজের মত করে যে যাঁর পথ খনন করে নিয়েছেন। এঁদের দ্বিতীয় প্রজন্ম—অর্থাৎ নীরদ মজুমদারের পুত্র-কন্যা চিত্রভানু এবং অদিতি ক্রমশ চিত্রশিল্পে তাদের আসন পাকা করে নিতে চলেছে এবং সম্প্রতি কলকাতাকে চমকে দিয়েছে চিত্রভানুর প্রথম একক প্রদর্শনী।

কমলকুমার আমাদের এই কলকাতাকে বড় বেশি ভালবাসতেন। শিশিরকুমার থেকে শুরু করে বটতলার প্রকাশনা —পুরনো কলকাতার এই দুই বিপরীত মেরুর মধ্যবর্তী এক আকরময় ভূমিতে ছিল তাঁর পদচারণা। এবং বোধহয় সে জন্যই সাহিত্যিক কমলকুমার তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্বে—অভিনয়, সঙ্গীত, প্রাচীন পুঁথির চর্চায় বা অন্যান্য হাতের কাজে শিল্পের বিভিন্ন ধারা থেকে রস আহরণ করে নিতে পেরেছেন।

শানু লাহিড়ীর এই পারিবারিক প্রেক্ষাপটটিকে বুঝে নিলে তাঁকে, তাঁর কাজকে, বিশেষ করে বর্তমানে যে বিশাল এক কর্মযজ্ঞে তিনি ঝাঁপ দিয়েছেন—তা বোঝা কিছুটা সহজ হবে। না হলে সাধারণ শিল্পীদের জগৎ তো শুধু তাঁদের স্টুডিওটা ঘিরে থাকে। সেই ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে বসে মস্ত সব ইজেল, ক্যানভাস, রং আর তুলি নিয়ে তাঁদের কাজ। কখনো কখনো বা স্কেচবুক নিয়ে চলে যান নির্জনে। আমাদের এই প্রাত্যহিকতার বাজারী ভিড়ের হট্টগোলের থেকে তাঁদের সম্পূর্ণ অন্য এক পৃথিবী। কিন্তু শানু লাহিড়ী শিল্পীদের এই তৈরি-করা নিজস্ব জগৎ থেকে বের হয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছেন আমাদের এই কুশ্রী ভাঙাচোরা কলকাতাটাকে একটু সুন্দর করতে। এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে দাঁড়াতে হয়েছে এক প্রবল প্রতিরোধের মুখে—রুচিহীনতার, হৃদয়হীনতার অন্ধ প্রাচীরের সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে অবিরাম।

অথচ এসবের কীই-বা প্রয়োজন ছিল তাঁর! অজস্র স্বীকৃতি, খ্যাতি, পুরস্কার—এসব তো তিনি পেয়ে গিয়েছেন অনেক আগেই। তাঁর জীবনপঞ্জীতে চোখ বোলাতে গেলে জানা যাবে, ছাত্রাবস্থাতেই তিনি একক প্রদর্শনী করে পুরস্কৃত হয়েছেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন আর্ট গ্যালারি থেকে ওঁর ছবি কেনা হয়েছে। শিল্পের রসগ্রহণের শিক্ষা নিয়েছেন প্যারিসের ল্যুভর্ থেকে এবং বিদেশে ওঁর ছবি প্রদর্শিত হয়েছে একাধিকবার। গত মে মাসে ছবি নিয়ে শানু বিদেশ পাড়ি দিয়েছিলেন। বাইরেও ওঁর নানা কাজ। সি এম ডি এ-র 'কলকাতাকে সুন্দর কর' বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন হাতে; আকাদেমি অব ফাইন আর্টস-এর এগজিকিউটিভ কমিটির সদস্যা এবং বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কন বিভাগের সর্বোচ্চ পদে আসীন।

তবে শানুর মত শিল্পীদের কী দরকার ছিল তথাকথিত গুহাবাসী নিঃসঙ্গ জীবনের বাইরে এসে কলকাতার রাজপথ থেকে শুরু করে বলাই সিংহ লেনের বস্তির দেওয়ালকে রঙে রঙে ভরিয়ে দেবার! প্রিয় কলকাতাবাসীর কাছে শানু লাহিড়ীর আবেদন—'সুতানুটি, গোবিন্দপুর গ্রাম থেকে যার শুরু, সে কলকাতা আজ অনেক বড় হয়েছে। কলকাতা আমাদের সকলের দায় বহন করে চলেছে।...আসুন, সাধ্যমত কলকাতার সেবা করি আর একটু শ্রীবৃদ্ধি করি।...কলকাতাকে যতটা সুন্দরী করতে পারি তারই চেষ্টা করে চলেছি দেওয়ালে রং দিয়ে ছবি এঁকে। সকলের সহযোগিতা ছাড়া এ প্রচেষ্টা বেঁচে থাকে না।...মনে রাখবেন, কলকাতা আমাদের গর্ব—কলকাতা তোমার, কলকাতা আমার। কলকাতার জয় হোক।'

এই কলকাতাই বোধহয় পারে শিল্পীকে এমন করে ঘর ছেড়ে সকলের মধ্যে নামিয়ে আনতে। যতই সে মিছিলের নগরী, আবর্জনার নগরী হোক না কেন, তার জল-হাওয়া আলো-বাতাসে এমন কোনো মায়াবী আকর্ষণ আছে, যার টানে শিল্পী তাঁর তুলি হাতে এসে দাঁড়ান রাজপথে আর কলকাতার ভাঙাচোরা দেওয়াল সেই তুলির স্পর্শে অপরূপ হয়ে ওঠার প্রতীক্ষায় থাকে। এ কি আর কোথাও সম্ভব! এ বোধহয় শুধু সম্ভব কমলকুমারের অতি-প্রিয় 'কলকাতা' এবং নীরদকুমারের অতি-প্রিয় 'পারী'তে। 'পারী' —'পুনশ্চ-পারী'।

কলকাতারই মেয়ে শানু লাহিড়ী তাঁর স্টুডিওর ছোট ইজেল আর ক্যানভাসের সামনে বসে না থেকে তাই নামলেন পথে। চার দেওয়ালে

ঘেরা স্টুডিও নয়, মস্ত কলকাতাটাই যেন তাঁর কাজের জায়গা। নোনাধরা স্যাঁতাপড়া ভাঙা দেওয়াল হল তাঁর প্রশস্ত ক্যানভাস। কিন্তু তিনি নির্জনতা ভাঙবেন বলে বাইরে বের হয়ে এলে কী হবে, আমরা কলকাতার মানুষেরা—শানুর 'প্রিয় কলকাতা-বাসীরা' কিন্তু তাঁকে নিঃসঙ্গই রেখে দিলাম। দুহাতে ভেঙেচুরে নষ্ট করলাম তাঁর কাজকে। তিনি নির্দয় দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু ভেঙে পড়েননি। বিন্দুমাত্র হতাশা গ্রাস করেনি তাঁকে—'ওরা ভেঙেছে বলেই তো বুঝতে পারছি আমি আছি। আমি কিছু একটা করতে পেরেছিলাম।'

'শানুদি, আগের কথাটা একটু বলুন না! কীভাবে ভেবেছিলেন সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটা?'—ওঁদের লেক টাউনের অর্ধসমাপ্ত নতুন বাড়িতে বসে প্রশ্ন করি শিল্পীকে। সবে বাইরের হাজারটা কাজের ঝামেলা মিটিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। ক্লান্ত তো নিশ্চয়, কিন্তু মুখে-চোখে এক আশ্চর্য ঔজ্জ্বল্য।

'দ্যাখো, আমার ছাত্রছাত্রীরা প্রায়ই আমার কাছে চাকরির জন্যে বলত। আমি নানা জায়গায় ওদের জন্যে অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। বারবার মনে হয়েছে, এই যে আজকাল স্কুলগুলোতে 'ওয়ার্ক এডুকেশন' শেখানো হয়—সাধারণভাবে মাত্র তিন মাসের শিক্ষায় শিক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পের কোনো অ-আ-ক-খ না জানা শিক্ষকদের না নিয়ে যদি সরকার থেকে এদের—না শুধু এদেরই বা বলি কেন, খোঁজখবর করে সত্যিকারের শিল্পী কিছু নতুন ছেলেমেয়েকে ওই পদে নেওয়া যেত, তবে স্কুলগুলোতে ওয়ার্ক এডুকেশন শিক্ষা নিশ্চয়ই একটা নতুন মাত্রা পেত। এই কাজটা কিন্তু আদপেই হচ্ছে না। যাকগে, অন্য কথায় চলে না গিয়ে বলি, আমি তখন ভাবলাম—এদের জন্যে কী করা যায়! আর তখনই এই পরিকল্পনাটা আমার মাথায় আসে। একদিকে ওরাও বেকার বসে না থেকে কাজ পাবে আর আমাদের এই ভাঙাচোরা কলকাতার দেওয়ালগুলোকেও একটু সাজিয়ে দেওয়া যাবে।'

দেওয়াল সাজানো কথাটা এককথায় বলতে যত সোজা, কাজে ঠিক তার উলটো। দেওয়ালজোড়া মস্ত এই অ্যাসবেসটাস শীটের ওপরে ছবিগুলো আঁকতে খরচ অনেক। কে দেবে সেই টাকা? শানু লাহিড়ী দরজায় দরজায় ঘুরেছেন। অবশেষে ডানকান অ্যাগ্রো ইনডাস্ট্রিজ প্রয়োজনীয় টাকা দিতে সম্মত হল।

'এটা আমি বলছি উনিশশো চুরাশি সালের মাঝামাঝি সময়ের কথা। তখন থাকতাম ল্যান্সডাউন রোডে। শুরুতে আমি বেছে নিলাম কাছাকাছি তিনটি জায়গা—লা মার্টিনিয়ার, ডায়োসেশান আর আলিপুর চিড়িয়াখানার দেওয়ালগুলো। প্রথম কাজ শুরু করলাম লা মার্টিনিয়ারের দেওয়ালের তেরশো স্কোয়ার ফিট জায়গা নিয়ে। ওখানকার প্রিন্সিপ্যাল মিস্ সুবায়া জায়গাটা আমাদের বিনামূল্যে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। ঠিক করলাম এই তেরশো স্কোয়ার ফিট জায়গায় টাঙানো হবে চল্লিশটি ছবি এবং প্রতিটি ছবি হবে আট ফুট বাই চার ফুট করে। যেহেতু স্কুলের দেওয়াল, তাই বিষয় নির্বাচন করতে গিয়ে আমি ছাত্রছাত্রীদেরই বেছে নিয়েছিলাম—ওরা পড়ছে, খেলা করছে, গাছ লাগাচ্ছে এই ধরনের সব ছবি।'

ডানকানের দেওয়া টাকা ওঁর হাতে এসেছিল চুরাশি সালের ষোলই আগস্ট। তারপর সে এক বিশাল পর্ব—প্রায় ময়দানবের যজ্ঞ! অ্যাসবেসটাস শীট কেনা হল। প্রয়োজনীয় রং বিনামূল্যে সরবরাহ করেছিলেন বার্জার পেইন্টস। কিন্তু কিনতে হল প্রচুর তুলি, আর নির্বাচন করা হল তাদের, যারা ওঁকে সাহায্য করবে। কাজ শুরু হল ওঁরই বাড়ির স্টুডিওতে।

'আমার তখন রবীন্দ্রভারতীর ক্লাস চলছে। প্রতিটি ছবির স্কেচ আর রং নির্বাচন করে দিয়ে আমি সকালে বের হয়ে যাই। ওরা সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত একটানা কাজ করে। আমি বাড়ি ফিরে ওরা চলে গেলে কাজে বসি আর আমার কাজ অনেক রাত পর্যন্ত গড়ায়। খাওয়া-দাওয়ার সমস্ত খরচ ছাড়াও ওদের আমি প্রতিদিন দিতাম ৫০ টাকা করে।'

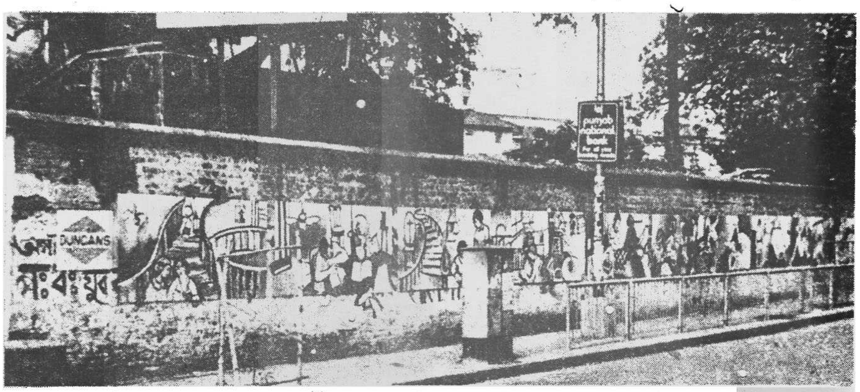
শুনলে সত্যিই বিশ্বাস হয় না, ওই বিশাল সাইজের চল্লিশখানা ছবির কাজ ওঁরা শেষ করেছিলেন মাত্র ষোল দিনে। মহালয়া তিথিতে রাত বারোটার পর পথঘাট নিঝুম হয়ে গেলে সারারাত ধরে ওই চল্লিশটি ছবিকে দেওয়ালে আটকিয়েছিলেন ওঁরা। এবং সেদিন সেই মুহূর্তে শানু লাহিড়ীর কল্পনায় ছিল এইভাবে বাকি দুটো দেওয়াল ভরিয়ে ফেলবেন যত দ্রুত সম্ভব এবং এক বছরের মাথায় ওই ছবিগুলো খুলে নিয়ে ময়দানে কোথাও মুক্তাঙ্গন প্রদর্শনীতে একসঙ্গে চিত্রপ্রেমীদের সামনে সাজিয়ে দেবেন। আবার পরে ফিরিয়ে দেবেন যথাস্থানে।

'সারারাত সেদিন আমরা কাজ করলাম। ফিলিপস থেকে আমাদের বড় বড় আলোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। মহালয়ার দিন টাঙালাম। তার পনেরো দিন পরে বিজয়া দশমীর দিন আমার ছবিতে বাইরের হাত প্রথম পড়ল। ওরা ছবিগুলোকে ভাঙতে শুরু করল। কত আর হবে—দু মাস কি তিন মাসের মধ্যেই ওরা একেবারে শেষ করে দিল সব।'

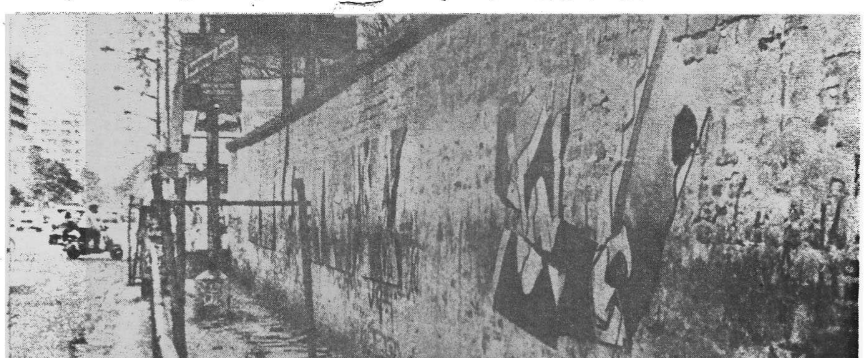
'কেন এরকম হল, শানুদি?'

'আরে অন্য কিছু না হোক, ওই অ্যাসবেসটাস শীটগুলোরও তো বেশ ভাল দাম। খুলে নিয়ে বাজারে বিক্রি করে দিলে লাভ কম হবে না। সাধারণ স্থানীয় লোকেরাই এই কাজ করেছে। বেশি কী আর বলব, সি এম ডি এ-র একটা ছোট ঝুপড়ি মতন আছে পার্ক সার্কাসে—সার্কাস এভিনিউ আর নাসিরুদ্দিন রোডের মোড়টাতে। একদিন গিয়ে দেখে এসো, ওই ঝুপড়ির চাল আর দেওয়ালগুলো হয়েছে আমার ওই ছবিগুলোর ভাঙা টুকরো দিয়েই।'

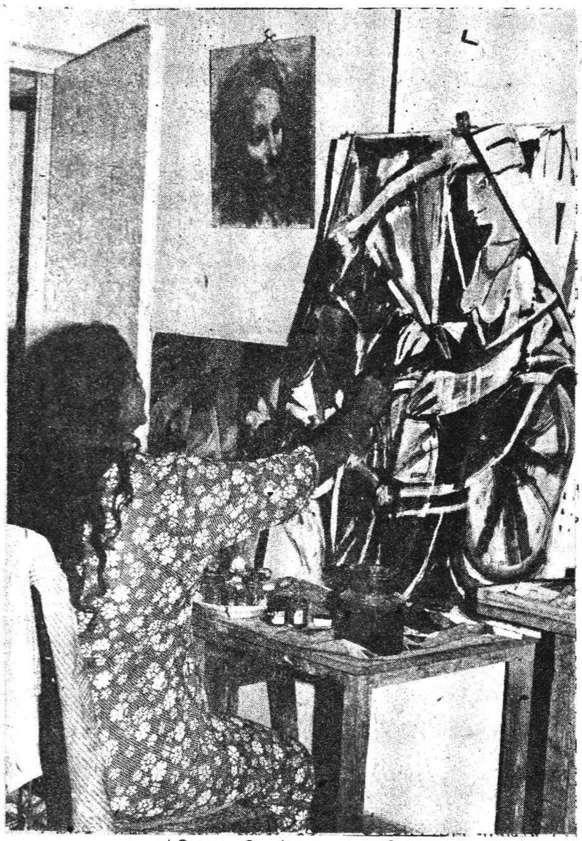
সাধারণ কোনো মানুষ হলে এই



লা মার্টিনিয়ার-এর দেওয়ালে শানু লাহিড়ীর পরিকল্পিত ছবি



ছবি ভেঙে ফেলা হয়েছে



স্টুডিয়োয় ছবি আঁকছেন শানু লাহিড়ী

ঘটনার পরে বোধহয় তলিয়ে যেত এক ভয়াবহ মানসিক অবক্ষয়ের গভীরে। কিন্তু শিল্পীরা তো অন্য ধরনের—তাঁরা কোথায় যেন প্রায় স্রষ্টার সমতুল্য। যাঁদের হাতে সৃষ্টির চাবিকাঠি, তাঁরা এই ক্ষয়ক্ষতিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে অনায়াসে চলতে পারেন।

'আমার ছেলেমেয়েরা ভীষণ ভেঙে পড়েছে, দুঃখ পেয়েছে। আমি ওদের বুঝিয়েছি। বলেছি, ওরা যে ভেঙেছে—এটাই তো প্রমাণ করে আমরা কিছু একটা করতে পেরেছিলাম। না করলে ভাঙবে কেন। আবার করব আমি—আমার সৃষ্টির থেকে ওদের ধ্বংসের হাত তো জোরালো হতে পারে না!'

ইতিমধ্যে উত্তর কলকাতার প্রধানত এক দরিদ্র বস্তি এলাকা বলাই সিংহ লেন থেকে রণজিত বোস নামে এক ভদ্রলোকের চিঠি এসে পৌছল শানু লাহিড়ীর হাতে—'আমরা এই পাড়াটাকে একটু সুন্দর করে তুলতে আপনার সাহায্য চাই।'

'ওখানে কিন্তু কোনো প্ল্যানমত কাজ করতে পারিনি। ওখানে তো কোনো বড় পরিষ্কার দেওয়াল ছিল না। কারও ঘরের দরজায়, কারোও ঘরের জানলার পাশের ছোট্ট একটু নোনাধরা ফালিতে ছবি আঁকতে হয়েছে আমাকে ওখানকার যত বস্তিবাসী ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে। ওরা সবসময় আমার চারিপাশে ঘিরে থাকত। কারও পায়ে জুতো নেই, কারো বা পরনে শুধু একটা ছেঁড়া ইজের—তেলের অভাবে চুলগুলো জট বেঁধে গেছে। ওদের হাতে রং তুলি তুলে দিয়েছি আমি। ইচ্ছেমত সেগুলো দিয়ে দেওয়ালে আমার কাজের সঙ্গে ছবি-ছবি খেল' করেছে ওরা। সব মিলিয়ে কিছু না শিখেই ভারি ভাল কাজ করেছিল ওরা নিজে নিজেই। ওঃ, ওখানে কাজ করতে গিয়ে তুলি যে আমার কত লেগেছিল তার ঠিক নেই। এখানে কিন্তু পুরো টাকাটাই আমাকে খরচ করতে হয়েছে।'

আশ্চর্য, দক্ষিণ কলকাতার তথাকথিত 'খ্যাত' এলাকায় শিল্পীর ছবিকে দুমড়ে মুচড়ে দেওয়াল থেকে ভেঙে নামিয়েছে ওরা। কিন্তু এই অখ্যাত বলাই সিংহ লেনের মানুষেরা পরম মমতায় গ্রহণ করেছে ওঁর এই প্রাচীর-অঙ্কনকে। দু-একজন যে 'আমার দেওয়ালে আঁকতে হবে না' এমন কথা বলেনি তা নয়। কিন্তু তাতে উনি কিছু মনে করেন নি। 'ওরা যে কীভাবে সহযোগিতা করেছে আমার সঙ্গে, তা না দেখলে বোঝানো শক্ত। এমনকি সেদিন রণজিত বোসের একটা চিঠি পেলাম, ওই বাচ্চাগুলো নাকি তাদের বাবা-মাকে বলে নিজেরা নিয়মিত স্কুলে যেতে, পড়াশুনা করতে শুরু করে দিয়েছে। নিজেদের তাগিদেই একটু সুন্দর হতে চাইছে ওরা। শুনে এত ভাল লাগল আমার।'

আরো অনেক পরিকল্পনা রয়েছে ওঁর। কিন্তু প্রধান সমস্যা টাকার। বারবার উনি ছুটে গেছেন মহাকরণে। চিঠি লিখেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পুরমন্ত্রীকে। শুধু ছবিই নয়, কলকাতার বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত মূর্তিগুলোকে নোংরা ময়লা আর পাখিদের পুরীষ থেকে পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব নিতে চেয়েছেন উনি। ওঁর ছেলেমেয়েরা সারা শহর ঘুরে এই কাজগুলো করবে সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। সাজিয়ে দেবেন বিভিন্ন পার্ক, রেস্তোরাঁ ও অফিসবাড়িকে। কিন্তু সরকার এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ নীরব।

অভিযোগ নিশ্চয় আছে শানু লাহিড়ীর, কিন্তু দুঃখ নেই। একটু টাকার ব্যবস্থা করতে পারলেই আবার কাজে হাত দেবেন উনি।

'আমার ছবিকে ভেঙে, কাজকে নষ্ট করে ওরা ভীষণভাবে আমাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, প্রবলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে আমি আছি, আমি আছি। কাজ করবই আমি। যতটা সাধ্য কলকাতাকে সুন্দর করব এই আমার স্বপ্ন।'

আপাতত শিল্পী যাচ্ছেন জলপাইগুড়ি। ওখানে ছবি নয়, নানা ছোট্ট তুচ্ছ উপকরণ দিয়ে শহরের এক-একটা অংশকে সাজিয়ে তুলবেন। ওখান থেকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস উনি পেয়েছেন।

ধ্বংসই শেষ কথা নয়। তারপরেও রয়েছে সৃষ্টির কাজ। একবার আমরা আমাদের হাতকে কলঙ্কিত করেছি। আর যেন সে ভুল না করি। কলকাতারই মেয়ে শানু লাহিড়ী কলকাতাকে আবার সুন্দর করে সাজিয়ে তুলবেন, সৃষ্টির নেশায় মেতে উঠবে ওঁর তুলি। সেই দিনটির জন্যে শুরু হোক আমাদের সাগ্রহ প্রতীক্ষা।

শিখা দাস

ফটো: সৈকত সান্যাল



সংক্ষিপ্ত পাক্ষিক রাশিফল

১৬—৩০ জুন ১৯৮৫

শ্রীগৌতম ভক্তিসিদ্ধান্ত ভারতী

পূর্ববাংলা অধুনা বাংলাদেশের কোটালিপাড়ার রতাল গ্রামের সুবিখ্যাত তন্ত্রসাধক বংশের আচার্য শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ ভারতী ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগৌতম ভক্তিসিদ্ধান্ত ভারতী। যোগ-তন্ত্র-জ্যোতিষ ছাড়াও সামুদ্রিকতত্ত্ব, প্রত্নতাত্ত্বিক তত্ত্বনিধি শ্রীভারতী 'দি অল ইণ্ডিয়া যোগতন্ত্র অ্যাণ্ড অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট'-এর প্রেসিডেন্ট। শ্রীভারতী স্বদেশ ও বিদেশে নানা উপাধি F.R.A.S. (London) I.M.I. S.C.A. & A.R. P. (Cal) K. B. S. (N. Delhi) অর্জন করেছেন। রাজ্য পঞ্জিকা সমূহের গণক ও অনুমোদক শ্রীভারতী 'জননী যূথিকা' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। 'সুকন্যা'র পাঠক-পাঠিকাদের জন্য শ্রীভারতী এবার প্রতিটি রাশির পক্ষে শুভ বার, সংখ্যা, বর্ণ, রত্ন ও ধাতু সম্পর্কে আলাদা ভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।



মেষ ঃ নিজের ভুলে পারিবারিক অশান্তি ও আর্থিক টানাটানির মধ্যে পড়তে হবে। শরীর বিশেষ সুবিধার নয়। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা বৃদ্ধির যোগ আছে। অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম হলে অশান্তি ভোগ। কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্ম হলে কিছু লাভ। আবার ভরণী নক্ষত্রস্থিত মেষ রাশির হঠাৎ দুঃখ বা অশান্তি। মেষ রাশির পক্ষে শুভ— সোমবার, সংখ্যা — ৬, বর্ণ — সবুজ, রত্ন — পান্না, গ্রহমূল — শ্বেতচন্দন, ধাতু — সোনা।



বৃষ ঃ কোন নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য চলতে পারে। আর্থিক অচলাবস্থা অনেকাংশে দূর হবে। তবে শরীরের দিকে নজর রাখা প্রয়োজন। রক্তচাপ বৃদ্ধি, বদহজম ও পেটের কোনো অসুখে কষ্টভোগ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অর্থ ও সুনাম বৃদ্ধির প্রবল যোগ আছে। সচেষ্ট হলে সঞ্চয়ও করতে পারেন। বৃষ রাশির পক্ষে শুভ—শুক্রবার, সংখ্যা—৮, বর্ণ—পীত, রত্ন—রক্তপ্রবাল, গ্রহমূল—অনন্ত, ধাতু—ইস্পাত।



মিথুন ঃ নিজের গুণে পারিবারিক শান্তি বজায় রাখতে পারবেন। কোনো সৎব্যক্তির সুপরামর্শে লাভ হতে পারে। কর্ম ও ব্যবসায়ে বৃহৎ যোগাযোগ আশা করা যায়। পুনর্বসু নক্ষত্রে জন্ম মিথুন রাশির জাতিকার ভ্রমণ যোগ আছে। গৃহশত্রু থেকে সাবধান। মিথুন রাশির পক্ষে শুভ—মঙ্গলবার, সংখ্যা—৭, বর্ণ—ধূমল, রত্ন—গোমেদ, গ্রহমূল—বিষতারক, ধাতু—রূপা।



কর্কট ঃ পারিবারিক, শারীরিক ও আর্থিক সব ক্ষেত্রেই মিশ্রফলের যোগ আছে। কর্ম ও ব্যবসায় নতুন যোগাযোগে আয় ও উৎসাহ বৃদ্ধি করবে। দূরভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। ধারে কাছে ভ্রমণেরও যোগ আছে। অন্যকে সন্দেহ করে নিজের ক্ষতি হতে পারে। কর্কট রাশির পক্ষে শুভ—বুধবার, সংখ্যা—১, বর্ণ—হলুদ, রত্ন—মুক্তা, গ্রহমূল—ব্রহ্মযষ্টি, ধাতু—সোনা।



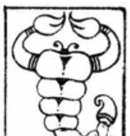
সিংহ ঃ আগের অবস্থার তুলনায় এ পক্ষে অনেক শুভফল আশা করতে পারেন। তবে দাঁত ও পেটের রোগে কষ্টভোগ হতে পারে। সচেষ্ট হলে সম্পত্তি সংক্রান্ত গোলযোগও অনেকটা মিটতে পারে। কোনো মাঙ্গলিক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন। মঘা নক্ষত্রে যাঁদের জন্ম তাদের ভ্রমণযোগ আছে। পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্রে জন্ম হলে ভোগাকাঙ্ক্ষা ও ভোগসুখ বৃদ্ধির যোগ আছে। সিংহ রাশির পক্ষে শুভ—শুক্রবার, সংখ্যা—৩, বর্ণ—লাল, রত্ন—হীরা, গ্রহমূল—বিল্ব, ধাতু—রূপা।



কন্যা ঃ গৃহশত্রুতা চললেও বিশেষ ক্ষতি হবে না। কাজের চাপ ও মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। শারীরিক দুর্বলতা থাকলেও অর্থকষ্ট হবে না। ভোগস্পৃহা বৃদ্ধির যোগ প্রবল। সচেষ্ট হলে বিয়ের যোগাযোগ কাজে লাগতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সুনাম ও শত্রুতা দুই বৃদ্ধি পাবে। কন্যা রাশির পক্ষে শুভ—শনিবার, সংখ্যা—৬, বর্ণ—সাদা, রত্ন—পীত পোখরাজ, গ্রহমূল—অশ্বগন্ধা, ধাতু—লোহা।



তুলা ঃ এ পক্ষে সকল ক্ষেত্রেই মিশ্রফল আশা করতে পারেন। শত্রুতাবৃদ্ধি উন্নতির পথে বাধা হতে পারে। কর্মক্ষেত্রেও কিছু নতুন বাধার ইঙ্গিত আছে। ভোগাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাবে। বিশাখা নক্ষত্রে তুলা রাশিতে জন্ম হলে এ পক্ষে বিশেষ সাবধান থাকা উচিত। তুলা রাশির পক্ষে শুভ—রবিবার, সংখ্যা—২, বর্ণ—ক্রীম, রত্ন—বৈদূর্যমণি, গ্রহমূল—বামনআটি, ধাতু—সোনা।



বৃশ্চিক ঃ অহেতুক অশান্তিতে মানসিক কষ্টভোগ। পুরনো রোগে কষ্ট পেতে পারেন। স্বার্থান্বেষী আত্মীয়স্বজন থেকে সাবধান। কারো সঙ্গে অকারণ মনোমালিন্য সৃষ্টি হতে পারে। কথা দিয়ে কথা রাখার ব্যাপারে সাবধান। কোনো সত্যিকারের বন্ধুকে ভুল বুঝে ক্ষতি হতে পারে। বৃশ্চিক রাশির পক্ষে শুভ—শনিবার, সংখ্যা—৪, বর্ণ—কচি কলাপাতা, রত্ন—নীলা, গ্রহমূল—ক্ষীরিকা, ধাতু—সীসা।



ধনু ঃ পারিবারিক শান্তি বজায় থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পেতে পারে। আয় ও ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা মুশকিল হবে। মূলা নক্ষত্রে যাদের জন্ম তাদের মানসিক চাপ থাকবে। বহু শুভ যোগাযোগ হাতছাড়া হতে পারে। অপরদিকে পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে জন্ম হলে সম্মানবৃদ্ধি ও কর্মক্ষেত্রে বৃহৎ যোগাযোগ আসতে পারে। ধনু রাশির পক্ষে শুভ—মঙ্গলবার, সংখ্যা—৯, বর্ণ—গাঢ় লাল, রত্ন—রক্ত প্রবাল, গ্রহমূল—অনন্ত, ধাতু—লোহা।



মকর ঃ প্রিয় পরিজনদের নিয়ে এ পক্ষটা মোটামুটি সুখেই কাটাতে পারবেন। কোনো ক্ষেত্রে বিরোধিতা চললেও তা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। সচেষ্ট হলে কর্ম ও ব্যবসায় সুনাম ও আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন। মকর রাশির পক্ষে শুভ—শনিবার, সংখ্যা—৮, বর্ণ—খয়েরী, রত্ন—গোমেদ, গ্রহমূল—শ্বেতচন্দন, ধাতু—স্বর্ণ।



কুম্ভ ঃ একগুঁয়েমির ফলে ক্ষতি হতে পারে। কর্ম ও ব্যবসায় শত্রুতার ফলে সুনাম ও অর্থহানি ঘটতে পারে। পেট, চোখ ও মাথার রোগে কষ্টভোগ। অসাবধানতার ফলে অপমানিত হবার যোগ আছে। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে কুম্ভ রাশির জাতিকার সম্মান বৃদ্ধি হবে। কুম্ভ রাশির পক্ষে শুভ—রবিবার, সংখ্যা—১, বর্ণ—ঘৃতাভ, রত্ন—চুনী, গ্রহমূল—বিল্ব, ধাতু—তামা।



মীন ঃ পারিবারিক জীবন শান্তিপূর্ণ, তবে কোনো আত্মীয়-স্বজনের জন্য সাময়িক অশান্তিভোগ করতে হবে। শেষ মুহূর্তে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির সাহায্যে বিপদমুক্তি ঘটতে পারে। সর্বক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক না হলে অপমানিত ও অহেতুক বড়রকমের ক্ষতি হতে পারে। মীন রাশির পক্ষে শুভ—বৃহস্পতিবার, সংখ্যা—৫, বর্ণ—সবুজ, রত্ন—পীত পোখরাজ, গ্রহমূল—শ্বেতচন্দন, ধাতু—ইস্পাত।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোন ঃ ২৪-০১৯৯), থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, রেজিঃ অফিস, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ঃ ২৭-২১৬৯, ২৭-৯২৯২, ২৭-৯৩১১, ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১, Telex 021-5092 IPPL IN

না জল ফুটিয়ে নেওয়ার দরকার
না বোতল ফোটানোর মেহনত করার
আর না গরম-ঠাণ্ডা দেখার !



প্রকৃতি, কেমন যুগ যুগ ধরে সহজ-স্বাভাবিক উপায়ে নবজাত বাচ্চার পুষ্টির ব্যবস্থা ক'রে আসছে !

প্রকৃতি, হাজার-হাজার বছর ধরে পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালিয়ে, শেষে, শরীর গড়ে তোলার প্রোটিন, শক্তিদায়ক কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহপদার্থ, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে নানান ভিটামিনের সঠিক ও সম্পূর্ণ সুষম অনুপাত কায়েম ক'রে নিয়েছে—আর সেজন্যেই মায়ের দুধ বাচ্চার জন্যে এক আদর্শ আহার।

দূষিত হবার আশংকাই থাকে না

আপনার কচি বাচ্চাটি যখন স্তন্যপান করে তখন তা কোনোরকম দূষিত হবার আশংকাই থাকে না—কারণ তাতে দুধ তৈরী করা, বোতল সাফ করা বা তাপমান দেখা ইত্যাদির কোনো প্রশ্নই তো ওঠে না—আর তাছাড়া, মায়ের দুধ তো বাচ্চার কাছে অমৃতের সমান !

ওছাড়াও, প্রকৃতি মায়ের দুধে "রোগ প্রতিরোধক বস্তু"-ও প্রদান করেছে, যার ফলে আপনার বাচ্চা আমাশয় রোগ ও অন্যান্য রোগের হাত থেকে সুরক্ষিত থাকে। আর, মায়ের দুধে আরও অনেক কিছু থাকে, যেমন, স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধকারী ভিটামিন 'সি'। ওসব ছাড়াও, যখন আপনি আপনার বাচ্চাটিকে স্নেহভরে বুকে নিয়ে দুধ খাওয়ান, তখন তার কী আনন্দই না হয়—আর ঐ ছোট্ট সোনাটি, এতবড় এই সংসারে, আপনার মমতাটুকুতেই নিজেকে কত সুরক্ষিত মনে করে।

সারা বিশ্বে প্রচলন বাড়ছে

এখন দিনে দিনে, এমন কি পাশ্চাত্য দেশেরও অধিক সংখ্যক মায়েরা, নিজেদের বাচ্চাদের বুকের দুধই খাওয়াচ্ছেন। কারণ, তাঁরা মায়ের দুধের অমূল্য পুষ্টিগুণ ও অন্যান্য গুণের মাহাত্ম্য আবার বুঝতে সুরু করেছেন।

কোনো অসুবিধা থাকলে

হ্যাঁ, যদি আপনি কোনো অসুবিধার দরুণ বাচ্চাকে বুকের দুধ না খাওয়াতে পারেন—যেমন ধরুন আপনার স্বাস্থ্য ভাল নয়, বা পুরোমাত্রায় বুকে দুধ আসছে না, তাহলে কি করবেন ? ঐরকম অবস্থায়, আপনাকে খুব সাবধানতার সঙ্গে বাচ্চাকে এমন আহার দেওয়া উচিত যার স্থান, মায়ের দুধের ঠিক পরেই ব'লে মানা হয়।

স্প্রে-ড্রায়েড আমূল স্প্রে

আমূল স্প্রে, পুষ্টির দিক দিয়ে এক সম্পূর্ণ সুষম আহার। কারণ এতে খুব উচুমানের প্রোটিন, সহজে হজম হয় এমন কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহপদার্থ সুষম অনুপাতে আর নানান অবশ্যকীয় ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সঠিকভাবে সম্মিলিত করা থাকে। এটি ফুটন্ত জলকে ঈষদুষ্ণ ক'রে নিয়ে তাতে গুললে, খুব সহজে গুলে যায়—আগে থেকে পেস্ট তৈরী ক'রে রাখার দরকার হয় না।

সাশ্রয়কারী

আমূল স্প্রে টিনে পাওয়া যায় এমন অন্য সমস্ত শিশু-আহারের মধ্যে সবচেয়ে সাশ্রয়কারী।

কারণ এটি হ'ল সেই আধুনিক দুগ্ধ-সমবায় সঙ্ঘের উৎপাদন, যারা এ দেশে "শ্বেত বিপ্লব"-এ অগ্রণী।

সাবধানতা

সব সময় মনে রাখবেন যে, বাচ্চার দুধের সমস্ত বাসনপত্র ও ফিডিং বোতল স্বাস্থ্যপ্রদ উপায়ে পরিষ্কারভাবে ধুয়ে গরম জলে ফুটিয়ে নেওয়া উচিত আর তার আহারের জন্যেও ফুটন্ত জলই ব্যবহার করা উচিত।

বাচ্চার সঠিক পুষ্টির জন্যে, টিনে দেওয়া নির্দেশমাত্রার একেবারে অনুসারেই আহার তৈরী করবেন।

বিনামূল্যে ! আমূল-পুস্তক

এতে অত্যন্ত উপযোগী তথ্যে ভরা এই এই অধ্যায় আছে—গর্ভাবস্থা, প্রসবের পূর্বে দেখাশোনা, প্রসব, স্তন্যপান, অন্ন আহার, শক্ত আহারে অভ্যস্ত করা, শিশুর নিত্যকর্ম, শিশুর উন্নতি, কয়েকটি সাধারণ ব্যাধির প্রতিকার, প্রাথমিক চিকিৎসা, শিশুর সাধারণ রোগ, শিশু বয়সে ভাবাত্মক সমস্যা, অসুস্থ শিশুর দেখাশোনা আর তার দিকে লক্ষ্য রাখা ইত্যাদি। এই পুস্তক ইংরাজী, হিন্দী, মারাঠি, গুজরাটি, তামিল, তেলেগু ও মলয়ালম ভাষায় পাওয়া যায়। এর জন্যে, আপনার পুরো নাম, ঠিকানা ও ১ টাকা ২৫ পয়সার ডাকটিকিট সমেত এখানে লিখুন: পোঃ বঃ ১০১২৪, বোম্বাই-৪০০০০১



আমূলস্প্রে

মায়ের দুধের ঠিক পরেই !

নির্মাতা: গুজরাত কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড, পোঃ বঃ ১০, আনন্দ ৩৮৮০০১, গুজরাত

ASP/AS-BEN6/83

SUKANYA 16 JUNE 1985 Regn. No. 42166/84/RNI Postal Regn. No. WB/CC-423 Rs. 3.50

